বাড়ী থেকে পালিয়ে

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

স্মৃতি লাইব্রেরী
১৩৫৭ সাল।
বসিরহাট।

দি বুক এম্পরিয়ম লিমিটেড
কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৫৩

দাম দুই টাকা

চিত্রশিল্পী—শৈল চক্রবর্তী
প্রয়োগশিল্পী—প্রশান্তকুমার সিংহ

দি বুক এম্পোরিয়ম লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২২।১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট
দি প্রিন্টিং হাউসের পক্ষে মুদ্রাকর পুলিনবিহারী সামন্ত ১০, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীমান গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

প্রীতিভাজনেষু—

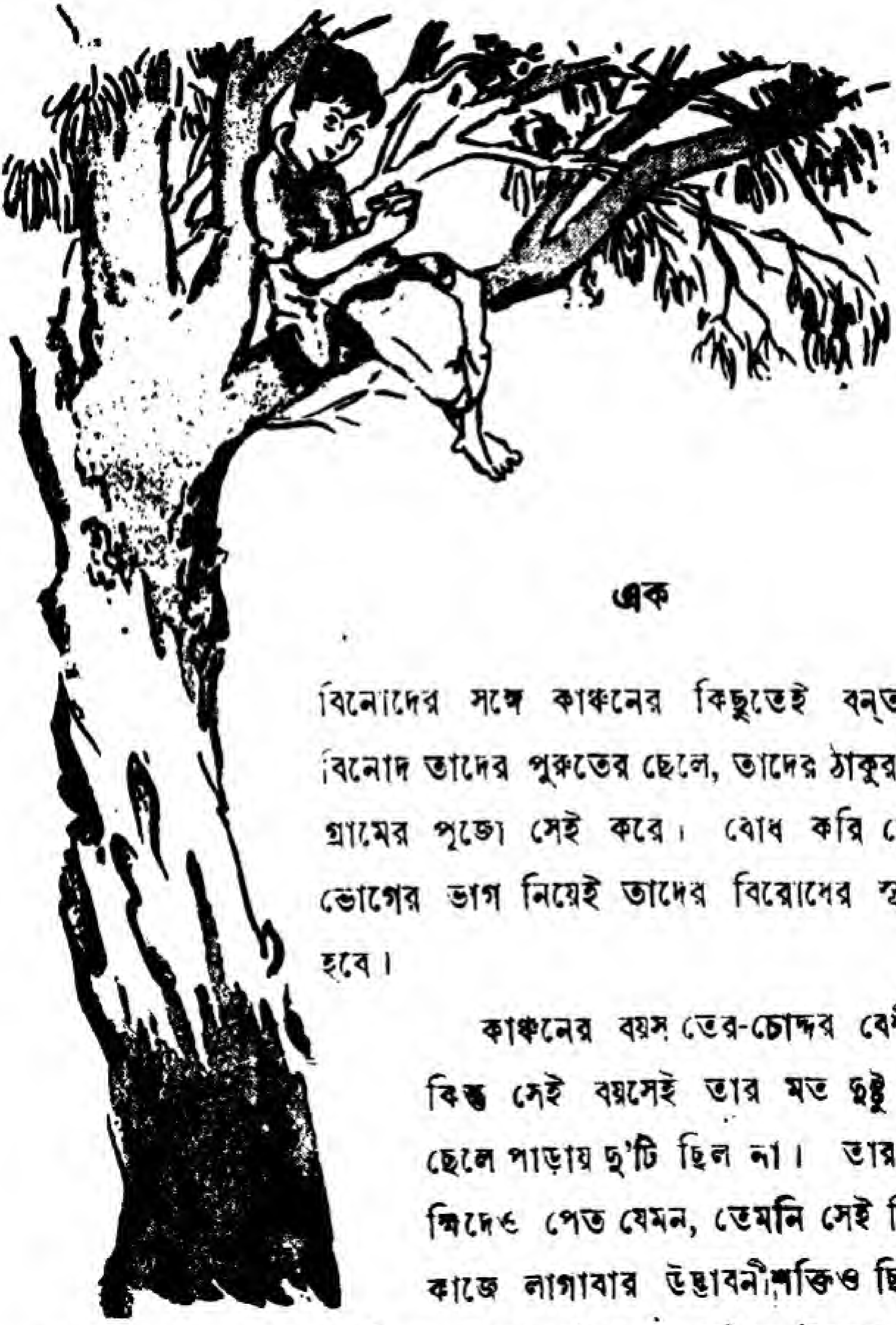

এক

বিনোদের সঙ্গে কাঞ্চনের কিছুতেই বনত না। বিনোদ তাদের পুরুতের ছেলে, তাদের ঠাকুর শাল-গ্রামের পূজো সেই করে। বোধ করি দেবতার ভোগের ভাগ নিয়েই তাদের বিরোধের সূত্রপাত হবে।

কাঞ্চনের বয়স তের-চোদ্দর বেশী নয়, কিন্তু সেই বয়সেই তার মত দুষ্টু দুর্দ্দান্ত ছেলে পাড়ায় দু'টি ছিল না। তার মুহুর্মুহু খিদেও পেত যেমন, তেমনি সেই খিদেকে কাজে লাগাবার উদ্ভাবনীশক্তিও ছিল তার অসাধারণ। ঘরের যা কিছু খাবার বৈধ ও অবৈধ উপায়ে সে ত আত্মসাৎ করতই, ঠাকুর এবং বিনোদের অংশেও ভাগ বসাতে ছাড়ত না। পূজোর আগে ঠাকুর-ঘরে গিয়ে যখন তার রাজভোগ থেকে

রাজকর সহজেই গ্রহণ কর্‌ত তখন পাথরের দেবতা প্রতিবাদ বা সমালোচনা করতেন না বটে, কিন্তু পূজোর শেষে নিজের অংশ থেকে কিছু ছাড়তে রক্ত-মাংসের মানুষ বিনোদের অত্যন্তই আপত্তি ছিল।

সেদিন স্নান করতে গিয়ে কাঞ্চন এর শোধ নিলে। বিনোদকে সাঁতার কাট্‌তে মাঝ-পুকুরে নিয়ে গিয়ে জলের ভিতরে তার মাথা চেপে ধর্‌ল। সাঁতার ভালো জানলেও এবং বয়সে কাঞ্চনের চেয়ে কিছু বড় হলেও বিনোদ গায়ের জোরে তাকে আঁট্‌তে পারত না। খানিকক্ষণেই হাঁফিয়ে, এক পেট জল খেয়ে বিনোদ যায় আর কি! তখন কাঞ্চন তাকে ছেড়ে দিয়ে বল্‌লে—'কেমন জব্দ! আর আমার সঙ্গে লাগ্‌বি?'

বিনোদের রাগ ততক্ষণে মাথায় চড়েছে। যতক্ষণ না এক কোমর জলে এল ততক্ষণ সে একটি কথা বলল না। কিন্তু তীরে পৌঁছেই তার তৈল-জীর্ণ ময়লা পৈতাখানি ছিঁড়ে কাঞ্চনকে এই ব'লে শাপ দিল যে ব্রহ্মণ্যদেব যদি সত্য হন তবে কখনো তার বিয়ে হবে না। ফি বছরই সে পরীক্ষায় ফেল্ করবে।

এই সুকঠিন অভিশাপে কাঞ্চনের মুখ এতটুকু হয়ে গেল; ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে সে ভাবে নি, তবু জোর ক'রে বল্‌ল, 'তোর শাপে আমার কচু হবে।'

এতক্ষণে বিনোদ কেঁদে ফেল্‌লে—'দে, আমার পৈতে খুঁজে দে।'

'এখন কান্না হচ্ছে, ছিঁড়তে গেলি কেন? আমি যাব খুঁজতে—ভা-রী দায় আমার!'

বাড়ী থেকে পালিয়ে

অনেক খোঁজাখুঁজির পর জলের তলা থেকে উদ্ধার ক'রে বিনোদ গিট্ দিয়ে পৈতা পরল।

'ছিঁড়ে গিট্ দিতে গেলি যে বড়? ভারী ব্রহ্মণ্যদেব!'

'বাঃ, আমি পৈতা না পরে যাই আর বাবা আমাকে ধরে ঠ্যাঙান্! তুমি ত ঐ চাও!'

:

সেই দিনই।

কাঞ্চনের বাড়ী পূজো সেরে আম-বাগানের পথে বিনোদ ফিরছে; কাঞ্চন তাকে ধরল, 'দাড়াও!' এক হাতে ক্ষীরের বাটি, অন্য হাতে দইয়ের ভাঁড় নিয়ে ভীতনেত্রে বিনোদ বল্ল, 'কি আবার?'

কাঞ্চন এতক্ষণ তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল, বল্ল, 'তোমার শাপ কাটান্ দাও।'

বিনোদ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বল্ল, 'ভাখ্ কাঞ্চন, শাপ আর কাটান্ যায় না। ব্রহ্ম-বাক্য যা মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে তা রদ করা ব্রহ্মারও সাধ্যি নয়।'

'হ্যাঁ, নয় আবার! আমি এত পড়ে-শুনে ফি বছর ফেল্ হ'তে থাক্ব আর তুমি ফাঁকতালে পাশ করে মজা লুট্বে, সে হচ্ছে না! বল আগে—'

'সে হবার নয়, কাঞ্চন, আমি ভেবে দেখলাম। শাপ উল্টে গেছে শাস্ত্রে এমন কোথাও লেখে নি। তা হ'লে পরীক্ষিত—'

'রেখে দাও তোমার পরীক্ষিত! যদি শাপ না কাটান্ দাও তবে ঐ ক্ষীরের বাটী আর দইয়ের ভাঁড় দিয়ে যাও।'

বাড়ী থেকে পালিয়ে

বিনোদ এবার গুরুতর সমস্যায় পড়ল। একদিকে শাস্ত্রের নজির, অন্য দিকে ক্ষীরের বাটি। এই উভয় সঙ্কটে সে মাথা খাটিয়ে বল্‌ল, 'শাপ ত কাটান্ যায় না রে! তবে এই বলছি, বিদ্যে তোর না হোক বুদ্ধি তোর খুব হবে। তাতেই তোর পুষিয়ে যাবে। বুঝ্‌লি কাঞ্চন? বামুনের বর, তাও মিথ্যে হবার নয়—'

বিদ্যা ও বুদ্ধির তারতম্য কাঞ্চনের কাছে স্পষ্ট ছিল না! সে এক ঝটকায় বইয়ের তাড় টেনে সমস্ত বই বিনোদের মাথায় ঢেলে দিল; অবশেষে ক্ষীরের বাটিটা কেড়ে নিয়ে এক আম-গাছের ডালে উঠে বস্‌ল। বিনোদের দিকে আর দৃষ্টিপাত না ক'রে পা দোলাতে দোলাতে যে আপাতমধুর বস্তুটি তার হস্তগত হয়েছিল সেই বিষয়ে একান্ত মনঃসংযোগ করল।

দুই

বিনোদ কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। খানিক পরেই বাড়ীর চাকর কাঞ্চনের খোঁজে দেখা দিল—'ছোট-বাবু, বাবা তোমায় ডাকছেন!'

চাপা গলায় কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করল 'কেন রে?'

'বিনোদ ঠাকুর—'

'কি বলেছে সে, শুনি?'

'তুমি নাকি পূজোর আগে লুকিয়ে লুকিয়ে ঠাকুরের ভোগ খেয়ে রাখো, তার পরে একদিন নাকি বিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে ঠাকুর পূজো করতে দাও নি—'

'এই সব বলেছে! পাজি কোথাকার! আচ্ছা, দেখ্‌ব তাকে আমি—'

'আবার আজ নাকি তুমি তার পৈতে ছিঁড়ে দিয়েছ! মাথায় দই ঢেলে—'

'মিথ্যে কথা! আমি পৈতে ছিঁড়েছি! বলুক দিকি সে! ওর ওই ঠাকুরের মাথায় হাত দিয়ে বলুক? ওই ত আমাকে শাপ দিলে! মার দই ঢেলেছি? বেশ করেছি, কাল ঘোল ঢাল্‌ব। দেখি কি করে ও!'

'বাবু তোমাকে এখুনি ডাক্‌ছেন! মালখানা থেকে সেই রূপো বাঁধানো চাবুকটাও বের করেছেন।'

'বাঃ রে! সে ত আমার চাবুক! আমার পিঠেই পড়বে নাকি?'

'তা কি জানি বাবু! এখন ত চল, তোমাকে নিয়ে যেতে পাঠালেন।'

'দেখ্‌ছিস না, আমি খাচ্ছি। যা তুই আমি যাব এখন।—মা কোথায় রে?'

'মা কাঁদছেন। তোমাকে আদর দেন বলে বাবা তাঁকে খুব বকেছেন।'

'যা যা এখন যা। বিরক্ত করিস্‌ নে। রাগ হয়ে গেলে এই বাটি তোর মাথায় ছুঁড়ে ভাঙ্‌ব তা বলে দিচ্ছি কিন্তু।'

'আমি ত যাচ্ছি, মাঠাকরুণ আমাকে চুপি চুপি বলে দিলেন কর্ত্তাবাবু খেয়েদেয়ে ঘুমোবার আগে তুমি যেন বাড়ী ঢুকোনা, বুঝলে?'

'যা যা, আর তোকে দাঁত বের করে হাস্‌তে হবে না—'

চাকর চলে গেল, কাঞ্চন ভাব্‌তে লাগ্‌ল, এখন কি করে। বিনোদ যে এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তা কি সে কোনদিন ভেবেছিল। যাই হোক্‌। কাঞ্চন আজ হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌তে পারল যে বিনোদ কেমন স্বার্থপর। সামান্য একবাটি ক্ষীরের জন্য—! না, আর কখনো সে অমন ছেলের সঙ্গে মিশ্‌বে না। কিন্তু এখন—এখন কি করা?

গাছ থেকে নেমে আম-বাগানের পাশ দিয়ে যে বাঁধা রাস্তা গেছে তাই দিয়ে সে হাঁট্‌তে সুরু করল—যেদিকে দু চোখ যায়। কতক্ষণ সে চলেছে, কিন্তু পথ আর ফুরোয় না। অবশেষে যেখানে পথ শেষ হ'ল সেটা রেল-ষ্টেশন।

একটু বাদেই একটা ট্রেণ এসে দাঁড়াল। কাঞ্চন একটুক্ষণ কি

ভাব্‌লে তার পর লোকজন কম এই রকম একটা কাম্‌রা বেছে নিয়ে গাড়ীতে উঠে বস্‌ল।

গাড়ী চলেছে, কোথায় যাচ্ছে কিছুই সে জানে না কয়েকটা ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়ালো। কত লোক উঠল, নাম্‌ল। কিন্তু কেউ তাকে একটি প্রশ্নও করে না। অবশেষে একটা জায়গায় গাড়ী দাঁড়াতেই একটি ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'খোকা নাম্‌বে না?'

'এটা কি ষ্টেশন?'

'বর্দ্ধমান। এ গাড়ী এখানেই দাঁড়াবে, আর যাবে না।'

অতএব তাকে নামতে হ'ল। ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করলেন 'কোথায় যাবে তুমি?'

সে একটু ভেবে বলল, 'কল্‌কাতায় যাব।'

'কিন্তু গাড়ী ত সেখানে যাবে না? কল্‌কাতায় গাড়ী পরেই আস্‌বে ওই ওধারের প্লাটফর্মে। ওভার-ব্রিজ্‌ দিয়ে যাবে, লাইন ডিঙিয়ে যেয়ো না যেন—বুঝ্‌লে?' ব'লে ভদ্রলোক মোট-ঘাট নিয়ে বার হয়ে গেলেন।

'কই হে, তোমার টিকেট কই?'

কাঞ্চন দম্‌বার ছেলে নয়, সহজ ভাবে উত্তর দিল, 'আমি কি আপনার গাড়ীতে চেপেছি নাকি? আমি ত বেড়াতে এসেছি।'

টিকেট-চেকার বল্লেন, 'ষ্টেশন হাওয়া খাবার জায়গা নয়।' তিনি অন্যত্র চলে গেলেন, কাঞ্চনও সেই ফাঁকে বেরিয়ে পড়ল।

তখন বেলা দুটোর বেশী। তার ভয়ঙ্কর ক্ষিদে পেয়েছে। সঙ্গে একটিও পয়সা নেই যে মুড়ি কিনেও খায়। কি করবে ভাবতে ভাবতে

চলেছে। কিছু দূর যেতেই দেখে একটা নাদুস্‌-নুদুস্‌ ছাগল তাকে গুঁতোতে তাড়া করে আস্‌ছে। সে কিছু হটে রাস্তা থেকে পাট্‌কেল কুড়িয়ে তাক্‌ ক'রে তাকে মারতে যাবে, এমন সময়ে সামনের চালাঘর থেকে একটি ততোধিক মোটা মেয়ে মানুষ শশব্যস্তে বার হয়ে আর্ত্তকণ্ঠে বল্লে, 'আহা মেরনি, বাবা, মেরনি। বাছা আমার মরে যাবেক।'

'মারছি না। কিন্তু বাছাকে সাম্‌লাও।'

ছাগলকে নিয়ে যেতেই তার নজর পড়ল সেই ঘরটির দোরের ওপর। একটা সাইনবোর্ড ঝুল্‌ছে, তাতে বিচিত্র ছাঁদে ও বানানে লেখা—

পবীত্র হীন্দু হোটেল—হীন্দু ভদ্রলোক-দিগের আহারের স্থান

সে স্ত্রীলোকটিকে বল্‌লে, 'এখনো কি তোমার হোটেলে খাবার-টাবার আছে?'

'খুব আছে, তুমি খাবে?"

'নিশ্চয়।'

কাঞ্চন খাওয়া-দাওয়া সেরে বল্‌ল, 'কত দাম দিতে হবে?'

'এমন কি আর খাইছ, যা খুসি দাও।'

'তোমরা নাও কত?'

'চৌদ্দ পয়সা।'

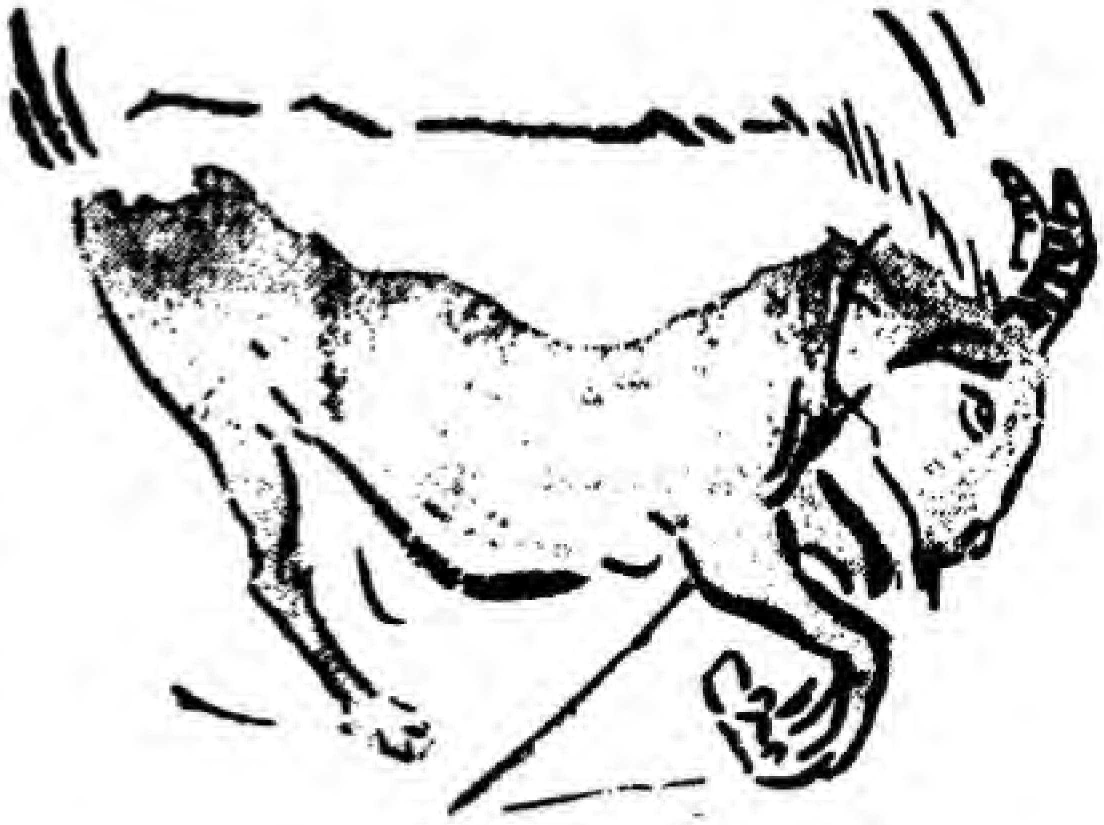

'আমি তো তার অর্দ্ধেকও খেতে পারি নি,—অর্দ্ধেক দেব।'

'তাই দাও।'

মশ্‌লা নিয়ে গভীর ভাবে চিবুতে চিবুতে কাঞ্চন বল্‌ল, 'তোমার যা রান্না, আর আমি যা খেয়েছি তাতে তোমাকে এক পয়সাও দেওয়া উচিত নয়। আমি কিছুই দেব না।'

হোটেলওয়ালী হেসে বল্‌ল, 'আচ্ছা, না দিবে ত নাই দিবেক্‌।'

মোটা ছাগলটি এসে এবার আদর করে তার হাত চেটে দিল, বিরক্ত হয়ে সে বলে উঠ্‌ল, 'দূর ছাই! ভালো আপদ্‌ দেখ্‌ছি!' তার পরে হাতটা ছাগলেরই লোমশ গায়ে মুছে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ষ্টেশনে ফিরে দেখ্‌ল একটা গাড়ী ওপারের

প্লাটফর্ম্ম থেকে ছাড়চে, সে তৎক্ষণাৎ গিয়ে তাতে উঠে বস্‌ল। পাশের ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস্ করল, 'মশাই এ গাড়ী যাবে কোথায় ?'

তিনি একটু বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলেন, 'কেন কল্‌কাতায়।'

কল্‌কাতা তখন আর কয়েকটা ষ্টেশন পরেই। পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে তার বেশ আলাপ জমে উঠেছিল। কল্‌কাতা কেমন জায়গা! সেখানে সে এই প্রথম যাচ্ছে কিনা! হ্যা, মামার বাড়ীই! মামা তাকে নিতে ষ্টেশনে আস্‌বেন। কিন্তু যদি দৈবাৎ ষ্টেশনে না আস্‌তে পারেন ? তা, তাতে কি হয়েছে, ভদ্রলোক না হয় তাকে মামার বাড়ী পৌছে দিয়ে আসবেন।—এই রকম নানান কথাবার্ত্তা। ভদ্রলোকের মুখে শুনে শুনে কল্পনায় সে কল্‌কাতার ছবি আঁক্‌ছিল। কল্‌কাতায় দিন্‌রাত নাকি এক সমান, রাত্রে চাঁদের আলো পথে পড়তে পায় না! এত আলো রাস্তায়! সব ইলেকট্রিক্! রূপকথার রাজপুরীর মত বড় বড় বাড়ী! আর কত লোকজন, গাড়ী ঘোড়া, সিপাই শান্ত্রী, কত কি!

আর দশ মিনিট পরেই তার কত স্বপ্নের, কত সাধের কল্‌কাতা!

কিন্তু একটা ভয় ছিল। সেটা প্রকাশ করে বল্‌তেই ভদ্রলোকটি বললেন, 'তাড়াতাড়িতে টিকিট করতে পারোনি, তা আর কি হয়েছে ? তুমি তো আর ইচ্ছে করে ঠকাচ্ছ না, আমি আগে বেরিয়ে গিয়ে একটা টিকেট কিনে এনে দেব, সেইটা দেখালেই তোমাকে ছেড়ে দেবে।'

হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী ঢুক্‌ল। গোলমাল হৈ চৈ, কুলী চাই ? কত লোক! বিদ্যুতের আলোয় কাঞ্চন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। ভদ্রলোকটি তার হাতে ওভার-কোট্ দিয়ে বল্লেন, 'এইটা ধর। আমি এক্ষুণি ফিরছি।'

তিনি চলে গেলেন। কাঞ্চন দেখ্‌লে ওভার-কোটের পকেটে সোনার ঘড়ি চেন, কাগজপত্র, আরো কত কি!

দশ মিনিট পরে তিনি ফিরে এসে টিকেটটা কাঞ্চনের হাতে দিলেন। টিকেটখানা নেড়ে চেড়ে কাঞ্চন দেখ্‌ল, তাতে লেখা আছে প্লাটফর্ম টিকেট, চার পয়সা দাম। নিজের শূন্য পকেটে হাত পুরে দিয়ে কুণ্ঠিত-স্বরে বল্‌ল, দেখুন, আমার কাছে খুচ্‌রো পয়সা ত নেই—'

'আহা থাক্! চার পয়সা আর দিতে হবে না। তোমার মামা কই? এসেছেন তিনি?'

'আস্‌বেন নিশ্চয়। তাঁকে দেখি—'

'আমি তবে চল্লুম, কেমন?'

ভদ্রলোক নিজের পথে চলে গেলেন। কাঞ্চন টিকেটখানা গেটে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন সন্ধ্যা। চারিধারে যেন সমারোহ লেগে রয়েছে। সে শুধু নিষ্পলকনেত্রে চারিদিকে চেয়ে রইল। এই স্বপ্নপুরী! কল্‌কাতা!

কাঞ্চন অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে ষ্টেশনের বিরাট কলেবর দেখ্‌ল। কতগুলো প্লাটফর্ম! একটাতে গাড়ী লাগে তো আরেকটাতে ছাড়ে। কত যাত্রী মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে আস্‌ছে। টিকেট ঘরই বা কত! ইউনিফর্ম-পরা একজন লোক, বোধ হয় রেলের কর্মচারী, কাঞ্চন সাহস করে তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল 'মশায় এখানে কটা ষ্টেশন?'

ভদ্রলোক আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, 'কটা ষ্টেশন মানে?'

'এতগুলো বাড়ী কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি।'

'ষ্টেশন তো একটাই জানি।' ব'লে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

বাড়ী থেকে পালিয়ে

একটা ষ্টেশন—আর এতগুলো প্লাটফর্ম! কাঞ্চন অবাক্ হয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, এও একটা ষ্টেশন, তাদের গাঁয়ে সেও একটা ষ্টেশন। কত তফাৎ! এই রকম একটা ষ্টেশন তাদের গাঁয়ে হয় না? সে যদি খুব—খুবই বড়লোক হয় তা হলে এই রকম একটা ষ্টেশন সেখানে তৈরী করবে। এই রকম একটা ষ্টেশন করতে কত টাকা লাগে কে জানে!

তার পর ধীরে ধীরে সে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে এল। কি করবে, কোথায় যাবে, কিছুই তার স্থির নেই। অনেক লোক যেদিকে চলেছে তারও গন্তব্য যেন সেই দিক।

বাইরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ সে বিচিত্র যানবাহনের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগ্‌ল। কতরকমের গাড়ী, কত রঙের কত ঢঙের। ঘোড়ার গাড়ী—ও আবার কি—মানুষ-টানা গাড়ীও আছে আবার! এত-গুলোর মধ্যে কেবল গরুর গাড়ীই যেন তার চেনা চেনা মনে হল।

গাঁয়ের ষ্টেশন থেকে বাড়ী যেতে লোকে গরুর গাড়ী ভাড়া করে, এখানে কই গরুর গাড়ীতে কেউ চাপছে না তো? গাড়ীগুলোর ছাপরও নেই—যেন কি রকম!

পাশে একজন ঝাঁকামুটে দাঁড়িয়ে ছিল, কাঞ্চন তাকে জিজ্ঞেসা করল ওই যে মানুষ টেনে নিয়ে যাচ্ছে ও কোন্ গাড়ী হ্যায়?'

'উওতো রিক্‌সা হ্যায়। তুম্ কিরায়া করো গে?'

'কেয়া বোল্‌তা?'

'ভাড়া লেওগে?'

'নেহি নেহি। এই রকম জিজ্ঞাসা করতা হ্যায়! আর ওই যে

সব গাড়ী, ঘোড়া নেই—আপ্‌সে আপ্‌সে চল্‌তা ও তো মোটর গাড়ী হ্যায়, নেহি ?'

মুটে গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল 'হাওয়া গাড়ী।'

'ঠিক ঠিক, উস্‌কা কথা হাম্‌ মার কাছে শুনেছি।'

কিন্তু মুটের সঙ্গে সদালাপ আর বেশী দূর অগ্রসর হল না। কেননা মুটেটা এর পর তার দিকে এমন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চেয়ে রইল যে কাঞ্চনের তা মোটেই পছন্দ হল না। সে মুটেটাকে পরিত্যাগ করল।

• জনতার পিছনে পিছনে অবশেষে সে হাওড়া-পুলের ওপর এসে উঠ্‌ল। কোথা থেকে হু হু বাতাস এসে চুলের ভেতর দিয়ে সোঁ সোঁ ক'রে বইতে লাগ্‌ল। কাঞ্চন আপনা আপনি ব'লে উঠ্‌ল—'আরে এ যে একটা নদী!'

তারি মতো যে ছেলেটি পাশাপাশি যাচ্ছিল সে বল্‌লে, 'নদী কি খোকা? এ যে গঙ্গা। জান না?'

গঙ্গা? কাঞ্চনের মনে হ'ল সেই গঙ্গা যার কথা মার গল্পে শুনেছে। তবু সে ঠক্‌বার ছেলে নয়, পাল্‌টে প্রশ্ন করল 'গঙ্গা কি নদী নয়? তুমি ত' খুব জান?'

তারি বয়সী একটা ছেলে তাকে 'খোকা' ব'লে ডাক্‌বে এ তার বরদাস্ত হবার নয়। তার ভারী রাগ হ'ল ছেলেটার ওপর। যদিও দু একটা অত্যাবশ্যক প্রশ্ন করবার কাঞ্চনের অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ হচ্ছিল কিন্তু এই রকম একটা অসভ্য ছেলেকে—? না, কিছুতেই না।

অত্যাবশ্যক প্রশ্নের একটা হচ্ছে এই যে, বইয়ে সে প'ড়েছে এই পুলটা নাকি জলে ভাস্‌ছে। সত্যিই কি তাই? যদি সত্যিই তাই

হয় তা হলে কি ক'রে সম্ভব? আর যখন ভাস্‌ছে তখন ডুব্‌তেও ত' পারে? আর ডোবে যদি হঠাৎ, তখন এই লোকজন গাড়ী ঘোড়া এ সবের কি দশা হবে?

কিন্তু, অমন ছেলেকে জিজ্ঞেসা করার চেয়ে—না, কাজ নেই। একটু যদি স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে তা হলে সে নিজেই পর্য্যবেক্ষণ করে নেবে। কিন্তু যা লোকের ঠেলা! ক্রমশঃ কেবল এগুতেই হচ্ছে—অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

তিন

একটা ষ্টীমার এদিকে আসছিল। বাঁক ঘুরতেই তার ফোকাসের তীব্র আলো এসে ব্রীজের গায়ে লাগ্‌ল। কাঞ্চন বিস্মিত চোখে সেই দিকে তাকাতে তাকাতে আপন মনে বল্‌ল, 'ওটা বোধ হয় একটা জাহাজ।'

'জাহাজ কি খোকা ও ত ষ্টীমার!'

আবার সেই ছেলেটি, আবার সেই 'খোকা'! কিন্তু কাঞ্চন এবার গুম্ হয়ে রইল, কোন উত্তর দিল না।

ছেলেটি কাঞ্চনের হাত ধ'রে বল্‌লে, 'জাহাজ দেখ্‌তে চাও? ওই দেখ সারি সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও সব বিলিতি জাহাজ—বিলেত থেকে আসে।'

ততক্ষণে ফোকাসের আলো সেই সব অতিকায় জাহাজগুলোর ওপরে পড়েছে। কাঞ্চনের বিস্ময় আর ধরে না। এই সব জাহাজের কথা সে গল্পের বইয়ে পড়েছে। তাদের গাঁয়ের জমিদারের ছেলে এই রকম একটা জাহাজে চেপে বিলেত গেছে নাকি!

বিস্ময়ের আতিশয্যে ছেলেটার মুঠোর মধ্যে যে তার হাত আছে তা সে ভুলেই গিয়েছিল, কিন্তু পুল পেরুতেই তার হুঁস্ হ'ল। এক ঝট্‌কায় সে হাত ছাড়িয়ে নিল—'যাও, আমি জাহাজ দেখতে চাই না। ও আমি অনেক দেখেছি।'

'দেখেছ, কিন্তু চাপো নি ত? আমি একদিন লুকিয়ে চেপেছিলাম। খালাসীরা দেখ্‌তে পেয়ে নামিয়ে দিল।'

কাঞ্চন গম্ভীরভাবে বল্‌ল, 'চাপি নি কিন্তু চাপ্‌ব একদিন। সমস্ত পৃথিবী ঘুরে ঘুরে বেড়াব বড় হ'য়ে।'

কাঞ্চনের কল্পনা যেন ছেলেটিকে স্পর্শ করল, তারও ত এমনি ইচ্ছা করে। সেও একদিন জাহাজে চেপে পৃথিবী ভ্রমণ করতে চায়—সেই 'আশীদিনে ভূপ্রদক্ষিণের' লোকটার মত। আজ যেমন এই পথে দেখা হয়েছে তেমনি কোনদিন হয় ত কোনো জাহাজে কি কোনো বিদেশে ওদের আবার দেখা হবে।

ছেলেটি এবার কাঞ্চনকে ভাল ক'রে দেখ্‌ল, তার পরে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোথায় যাবে খোকা?'

'যাও আমি তোমার সঙ্গে যাব না।' ব'লে রাগ ক'রে কাঞ্চন অন্য দিকে ফিরে দাঁড়াল। ছেলেটি কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক্‌ হয়ে একটু অপেক্ষা ক'রে অবশেষে চলে গেল।

না, আর ছেলেটাকে ভিড়ের মধ্যে দেখা যায় না। তখন কাঞ্চন আবার চল্‌তে সুরু করল। কিন্তু ছেলেটা থাক্‌লেই ভালো ছিল যেন। বেশ এক সঙ্গে গল্প করতে করতে যাওয়া যেত।

যাক্‌ গে! ভারী অসভ্য কিন্তু! ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে জানে না আদপেই। সে হ'ল গিয়ে কাঞ্চন—তাদের পাড়ার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, সব ছেলেই তাকে সম্ভ্রম ক'রে চলে আর তাকেই বলে কিনা খোকা! খোকা ত যারা দুধ খায়, হামাগুড়ি দেয়। মণ্টু, ন্যাপ্‌লা—ওরা খোকা।

তবু, তার কাছে কল্‌কাতার হাল-চালটা জানা যেত। যাক্ গে, সে নিজেই দু'দিনে জেনে নেবে। সেই বা কিসে কম!

ও বাবা, এ কি! এ যে কেবলই দোকান। রাস্তার দু'ধারেই। ফলের, খাবারের, মনোহারী জিনিষের! কি রকম ইলেক্‌ট্রিক্ আলো দিয়েছে! এত দোকান—এত জিনিষ-পত্র—এত সব কেনে কে!

কাঞ্চন অবাক্ হয়ে দোকান দেখ্‌তে দেখ্‌তে পথ চল্‌ল। কোনো দোকানী হয়ত জিজ্ঞাসা ক'র্‌ল—'কি চাই খোকা?' সেখানে কাঞ্চন মুহূর্ত্ত-মাত্র দাঁড়ালো না। কেউ যদি জিজ্ঞেসা কর্‌ল—'কি নেবে বাবু?' কাঞ্চন তাকে অনুগ্রহ ক'রে কিছুক্ষণ

সেখানে দাঁড়িয়ে নেবার যোগ্য কি কি জিনিষ আছে একবার খতিয়ে দেখ্‌ল, তারপর গম্ভীরভাবে মন্তব্য কর্‌ল, 'বাঃ, বেশ দোকান তোমার!'

অধিকাংশ দোকানদার তাকে গ্রাহ্যই কর্‌ল না। না করুক্। এই রকম দু'-একটা ভারী দোকান তাদের গাঁয়ে করতে হবে। বিশেষতঃ ঐ মনোহারী দোকানটার মত।

হঠাৎ কাঞ্চন দেখে কি, ভিড়ের মধ্যে একজন গুণ্ডা গোছের লোক এক ভদ্রলোকের পকেট থেকে মনিব্যাগ্ তুলে নিচ্ছে। গুণ্ডাটা বিনা বাক্যব্যয়ে সরে পড়ছে দেখে কাঞ্চন ভদ্রলোককে গিয়ে বল্‌ল, 'ও মশাই, ওই লোকটা আপনার পকেট থেকে কি নিয়ে পালাচ্ছে।'

'য়্যা তাই নাকি? তাই ত! ধর, ধর—চোর, চোর!' ভদ্রলোকের আর্তনাদে চারিধার সচকিত হয়ে উঠ্‌ল—লোকটাও ধরা পড়্‌ল। তার পর মার যা খেল লোকটা! অবশেষে পাহারাওয়ালা এসে পড়্‌ল, লোকটার কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে চল্‌ল। কাঞ্চনের ভারী মায়া হ'তে লাগ্‌ল। সেই ত ধরিয়ে দিলে!

ভদ্রলোক বল্লেন, 'আমার এক শ' টাকা ছিল ব্যাগে। দেখি।' তার পরে নোট ও টাকা গুণে এক গাল হেসে বল্লেন, 'সব আছে, কিছু নিতে পারে নি।'

একজন বল্লে, 'ওই ছেলেটির জন্যই ত পেলেন। ওকে কিছু দিন।' আরো কয়েকজন তার কথায় সায় দিল। ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন, 'আপনারা যখন বল্‌ছেন, তা দেওয়া উচিত, তা দেওয়া উচিত। এই ট্রাম্, রোখো রোখো—' ব'লে চলন্ত গাড়ীতে তিনি উঠে পড়লেন। যে লোকটি অনুরোধ করেছিল সে বল্‌লে—'বেশ লোক

কিন্তু! না দিয়েই চলে গেল!' যে লোকটি সায় দিয়েছিল সে শুধু বললে—'কলিকাল!' তার পর যে যার কাজে চলে গেল, কাঞ্চন আবার পথ চলতে লাগল।

এক জায়গায় দেখে, নানা রকম জিনিষের স্তূপাকার, তার পাশে একটা প্যাকিং বাক্সে ব'সে তারই বয়সী একটি ছেলে বিচিত্র সুরে ছড়া কাটছে—

'নীলামওয়ালা এক্ আনা,
জার্মান্‌ওয়ালা এক্ আনা!
সস্তাওয়ালা এক্ আনা,
সুবিস্তাওয়ালা এক্ আনা!
লে-যাও বাবু এক্ আনা!

ওই ছেলেটা এই সব এত জিনিষের মালিক নাকি? কাঞ্চনের হিংসে হতে লাগল। আঃ, যদি কিছু পয়সা থাকত তার, সব রকম কিছু কিছু কেনা যেত। এত সস্তায় এত রকমের জিনিষ!. তাদের গাঁয়ে হ'লে সবার তাক্ লেকে যেত!

মনে মনে এক আনার সিরিজের তারিফ করতে করতে কিছু দূর না এগুতেই দেখে আরেক জন লোক হাত নেড়ে সুর ক'রে হাঁকছে—

'ছুরি কাঁচি দু পইসা! ঘড়ি পেন্‌সিল দু পইসা!
তালা চাবি দু পইসা! রকম্ রকম্ দু পইসা।
সাবান্ ফিতা দু পইসা! লে-যাও বাবু দু পইসা!'

কাঞ্চন একেবারে তাজ্জব হয়ে গেল। তার বিশ্বাস হচ্ছিল না,—এমন সব চমৎকার জিনিষ দু' পয়সায়! ওরই মধ্যে যেটা তার কাছে

সব চেয়ে বহুমূল্য মনে হ'ল সেইটা দেখিয়ে পসারীকে জিজ্ঞেস করল—'ওর দাম কত?'

'দু পইসা। হরেক চীজ দু পইসা!'

কাঞ্চন ভাবতে লাগল, বাড়ী থেকে পালাবার সময় যদি বুদ্ধি ক'রে কিছু পয়সাও সঙ্গে আনত! বাবা বলেন, রাগের মাথায় কাজ করলে পরে পস্তাতে হয়। কথাটা যে সত্যি এত দিনে তা বোঝা গেল! রাগের মাথায় বাড়ী ছেড়েই ত সে পয়সা আন্‌তে ভুলে গেছে। কত ভাল ভাল জিনিষ অত সস্তায় যাচ্ছে—এ কি আর বেশীক্ষণ পড়ে থাকবে? কাল কি আর পাওয়া যাবে? মণ্টুর জন্য একটা বাঁশী, ন্যাপলার জন্য একটা রবারের বল্ আর নিজের একটা ফ্যান্সী হাতঘড়ি—অন্ততঃ এগুলো থাক্‌লেও হয়।

ঘুরে ঘুরে সে সেই দ্রব্যসম্ভার পর্য্যবেক্ষণ করছে এমন সময়ে কে যেন তার নড়া ধ'রে জোরে এক হ্যাচ্‌কা টান দিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তার পাশ দিয়ে একটা মোটর হর্ণ দিয়ে বেরিয়ে গেল। লোকটা বল্‌ল, 'আর একটু হ'লেই গেছ্‌লে যে! ফুটপাথ্ ছেড়ে রাস্তায় নামে কখনো?'

কাঞ্চন এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝ্‌ল, বল্‌ল—'আমায় চাপা দিত নাকি?'

'দিত না আবার!'

'সে কি? গাড়ীতেই ত মানুষ চাপে জানি, গাড়ীও আবার মানুষ চাপে?'

'আল্‌বাৎ! রোজই ত দু'-চারটা মোটরে তলায় মরছে।

কলকাতার রাস্তায় খুব সাবধানে চল্‌বে, ফুটপাথ্ ছাড়া চল্‌বেনা—আর রাস্তা পেরুবার সময় চারিদিক দেখবে। বুঝলে?'

কাঞ্চন মোচড়ানো হাতটার শুশ্রূষা করতে করতে ঘাড় নাড়ল।

'লেগেছে নাকি হাতে?'

'খু-উব। আপনি যেমন ক'রে টান্‌লেন।'

'তোমার ভাগ্যি যে বেঁচে গেছ। আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।'

কাঞ্চন চুপ ক'রে রইল। ভাবখানা এই যে ধন্যবাদ সে কিছুর জন্য কারুকেই দেয় না।

'তোমার বাড়ী কোথা?' কাঞ্চন চুপ।

'বুঝতে পেরেছি, তুমি কলকাতার নও। কোথায় দেশ?' কাঞ্চন উত্তর দেয় না।

'বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছ বুঝি? বোধ হয় বাবা মেরেছিল? সত্যি ক'রে বল।' কাঞ্চন এবার ঘাড় নাড়ে।

'কেন?'

'রোজগার করতে।'

'এই বয়সে? কার জন্য রোজগার?'

'মার জন্য। আমার মার বড় দুঃখ।'

'তোমার কে আছে আর?'

'বাবা আছেন, দু' ভাই আছে। তারা ছোট।'

'বাবা আছেন! তবে তোমার মার দুঃখ কিসের?'

'বাবা মাকে একটাও পয়সা দেন না কিনা, তাই মা আমাদের কিছু কিনে দিতে পারেন না। তাই মা'র দুঃখ। আমি রোজগার ক'রে মাকে টাকা দেব। তাই বাড়ী থেকে বেরিয়েছি।'

চার

খানিক থেমে লোকটি বল্‌লে, 'তা বেশ। তা তুমি কি কাজ পার?'

'সব কাজ।'

'বটে? আমার দোকানে বসে বিক্রী করতে পারবে?'

'খুব। আপনার কিসের দোকান?

'সন্দেশের দোকান।'

কাঞ্চন অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বল্‌ল—'নিশ্চয় পার্‌ব।'

তার উৎসাহে কিঞ্চিৎ বিচলিত হ'য়ে লোকটা বল্লে, 'বল কি! আমার সন্দেশ সব খেয়ে উড়িয়ে দেবে না তো?'

'না, না। কখ্‌খনো না!'

'তুমি খাবে-দাবে, তা ছাড়া তোমাকে মাসে পাঁচ টাকা দোব। রাজি আছ? সকালে দু'পয়সা করে পাবে জলখাবারের—তাতে তুমি যা খুসী খাও; কিন্তু আমার সন্দেশ তুমি খেতে পাবে না, ওর দাম অনেক, চার পয়সার নীচে নেই।

কাঞ্চন ঈষৎ ম্লান হ'য়ে বল্লে—'তা হোক! আমি পার্‌ব; সন্দেশের কাছে বসে থাক্‌লেও ভাল লাগে।'

দু'জনে কলেজ ষ্ট্রীটের মোড় বরাবর এসেছে, তখন অপর দিক্‌ দিয়ে মহা সমারোহে একটা বিয়ের শোভাযাত্রা চলেছে। কাঞ্চন অত্যন্ত বিস্ময়ে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'এত লোক আলো কাঁধে ক'রে যাচ্ছে কেন?'

'কোনো বড়লোকের বিয়ে হচ্ছে, তারই প্রোসেশান্।'

'ওঃ! কী চমৎকার বাজ্না—নাচ্তে ইচ্ছে করে।'

'নেচ না যেন—তা হ'লে আবার মোটর চাপা পড়বে!'

'ওটা কি বাজ্না? কখনো শুনি নি ত!'

'ও হচ্ছে ব্যাণ্ড্। কেল্লার গোরাদের বাজ্না, দেখ দেখ—ওই চতুর্দোলায় বর আসছে। দেখ্ছ, দিব্যি বরটি!'

কোন উত্তর না পেয়ে লোকটি ফিরে দেখে কাঞ্চন কাছে নেই। কোথায় গেল? পাশের একজন লোককে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—'মশাই, এখানে একটি ছেলে ছিল, কোন্ ধারে গেল দেখেছেন?' সে প্রশ্ন পাশের লোকটির কানেও গেল না।

কাঞ্চন তখন লোক-লস্কর, ব্যাণ্ড্, ব্যাগ্‌পাইপ, চতুর্দোলার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে—সন্দেশের দোকানের কথা তার মনেও নেই।

পাঁচ

শোভাযাত্রা যেখানে গিয়ে শেষ হ'ল সে এক প্রকাণ্ড বাড়ী। লাল, নীল, সবুজ নানা রকমের আলোকমালায় তাকে সাজানো হয়েছে; বাড়ীখানিকে কাঞ্চনের আলাদীনের মায়াপুরী বলে মনে হতে লাগ্‌ল। এর ভেতরে না জানি কী রহস্যই আছে!

বর অনেকক্ষণ বাড়ীর মধ্যে চলে গেছে। অনেক লোক—তাদের অধিকাংশই নিমন্ত্রিত অভ্যাগত, ভেতরে যাচ্ছিলেন। কাঞ্চন ভাবতে লাগ্‌ল সেও যাবে কিনা। অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়েও ত যাওয়া-আসা করছে। কাঞ্চন একবার নিজের বেশভূষার দিকে তাকাল,—তুলনা ক'রে দেখল তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাকের সঙ্গে এ যেন ঠিক খাপ খায় না।

কাঞ্চন মনে মনে ইতস্ততঃ ক'রতে লাগল। কিন্তু অবশেষে যখন ভেতর থেকে লুচি ভাজার চমৎকার গন্ধ তার নাকে এসে লাগ্‌ল তখন আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সে সমীচীন মনে করল না। ভিড়ের মধ্যে মিশে, তাদেরই একজন হয়ে বেশ সপ্রতিভ ভাবে একেবারে ভেতরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

ভেতরে গিয়ে দেখে এক বৃহৎ আসর। নানা আকারের নানাবিধ ভদ্রলোক সেই আসরে নানাভাবে শোভা পাচ্ছেন। কতকগুলি লোক অত্যন্ত তটস্থভাবে তাদের আদর-আপ্যায়ন করছে। সে জায়গাটা তার আদপেই ভাল লাগ্‌ল না। সেখানে থেকে স'রে আসরের আর

এক প্রান্তে গেল, সেখানে তখন গানবাজনার চক্রান্ত চল্‌ছে। কৌতূহলের বশে সেও সেখানে গিয়ে বস্‌ল।

খানিক বাদেই গান সুরু হ'ল। খানিকক্ষণ শুনে আর কাঞ্চনের সহ্য হ'ল না, সে উঠে দাঁড়াল। পাশের একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খোকা, উঠলে কেন? ব'স, ব'স।'

কাঞ্চন তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, 'মশাই, লোকটা অমন ক'রে চেঁচাচ্ছে কেন?'

ভদ্রলোক আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লেন—'চেঁচাচ্ছে! চমৎকার গাইছে। ও হচ্ছে ধ্রুপদ, সবাই গাইতে পারে না। উনিই ভূতো বাবু, নমস্ত ব্যক্তি।'

কাঞ্চন বল্‌লে—'হোক্ গে ভূতো বাবু। ও-কি গান? এ যে মারামারি কাণ্ড!'

কাঞ্চন সেখান থেকে উঠে গেল। 'যেন জ্যেঠামশাই' কাঞ্চনের উদ্দেশে এই মন্তব্য ক'রে ভদ্রলোক আবার 'ভৌতিক' গানে মনোনিবেশ করলেন।

কাঞ্চন এ-ঘর ও-ঘর ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে যেখানে বিয়ে হচ্ছিল সেই ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। বর-কনে পাশাপাশি বসে আছে, তাদের সম্মুখে আগুন জ্বলছে এবং শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-কলাপ চল্‌ছে। আগুনের দীপ্তিতে চন্দন-চর্চ্চিত কনের আনত মুখখানি কাঞ্চনের ভারী ভাল লাগ্‌ল। সে দরজার পাশে একধারে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে প্রায় তারই

সমবয়সী সেই ছোট্ট মেয়েটির দিকে চেয়ে রইল। সমস্ত বিবাহ ব্যাপারটাই তার হঠাৎ ভারী ভালো লেগে গেল।

এর আগে যদি কেউ তাকে ঠাট্টার ছলেও বলেছে 'তুই বিয়ে করবি?' তখন সে তাকে কেবল মারতে বাকি রেখেছে; বরং তার চেয়ে কেউ তাকে প্রাণ দিতে বললে তাতে সে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত ছিল। আজ কিন্তু তার মনে হ'ল মরার তুলনায় বিয়ে করাটা নিতান্ত খারাপ নয়, বরং বিয়ে করাতে বেশ মজা আছে।

ছেলেবেলায় রাম-সীতার ছবি দেখে সে নাকি মাকে বলেছিল—'মা, আমার সীতার মত বউ চাই।' মা প্রতিবেশিনীদের কাছে তার এই দুর্ব্বলতার কাহিনী প্রকাশ ক'রে আজও কৌতুক করেন। এজন্য মার ওপর তার এক-এক সময়ে এমন রাগ হয়!

সে নাকি বলেছিল—'আমি রামের মত রাজা হয়ে বসব, সীতার মত বউ আমার পাশে বসবে, মণ্টু আমার মাথায় ছাতা ধরবে, ন্যাপ্‌লা হনুমানের মত হাতজোড় করে থাকবে।'

মা বলেছিলেন—'কিন্তু ন্যাপ্‌লার যে লেজ নেই।'

সে জোরের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল—'লেজ হবে! লেজ হবে, মা। তুমি দেখো, বড় হ'লে ওর লেজ হবে।'

তার ছোটবেলার এই গবেষণা নিয়ে প্রায় হাসাহাসি হয়। এই লেজ হবার কথা ভাবলে তার নিজেরও আজ হাসি পায়, যদিও সে হাসে না। ন্যাপলার লেজ না হয় নাই বেরুল, মণ্টু যদি ছাতা ধরার চেয়ে ঘুড়ি ওড়ানোটাই বেশী যুক্তিযুক্ত মনে করে তাতেও তার আপত্তি নেই, কিন্তু সীতার মত বউ পাবার বাসনাটা তার মনে বহু দিন পরে

হঠাৎ জেগে উঠল। একটা বউ না পেলে আর চলছে না। অন্ততঃ সীতা যদি এ যুগে সুলভ নাও হয়, এই মেয়েটির মত একটি হ'লেও তার চলবে।

কাঞ্চনের মন যেন উদাস হয়ে গেল। উদাস হবার আর একটা কারণ, সেই লুচি ভাজার গন্ধটা বিয়ের ঘর পর্য্যন্ত হানা দিয়েছিল। অবশ্য সেটা গৌণ কারণ কিন্তু ক্রমশঃ সেইটাই মুখ্য হয়ে উঠতে লাগল। যে ঘরে এই বিবাহোৎসবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ পুঞ্জীভূত হচ্ছে সেই ঘরটি বের করবার জন্য কাঞ্চন ব্যস্ত হয়ে উঠল। কাঞ্চন এখন কলম্বাসের মত আবিষ্কার করতে চায়—কিন্তু আমেরিকাও নয়, সীতাও নয়, সেই লুচি ভাজার ঘরটা।

কিন্তু সেই ঘরটি বোধ হয় অন্দরমহলে। অনেক চেষ্টা ক'রেও কাঞ্চন সেখানে যাবার পথ খুঁজে পেল না। বাড়ীটা যেন গোলকধাঁধার মত অবশেষে বিরক্ত হয়ে বাইরে গিয়ে সে রাস্তার যানবাহনের গতিবিধি নিরীক্ষণ করতে লাগল। কিন্তু তাও বেশীক্ষণ ভাল লাগল না। অতঃপর সে ব্যাণ্ডওয়ালাদের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করল। তাদের বাঁশীর বহর আগেই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সেগুলোর অদ্ভুত আকার-প্রকারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জানবার তার আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু ব্যাণ্ডওয়ালারা এতই গম্ভীরপ্রকৃতির যে তাদের সঙ্গে কাঞ্চনের ভাব জমল না।

অগত্যা সে আবার বাড়ীর ভেতরে গেল। যেখানে বিবাহপর্ব্ব চলছিল সেই ঘরটির কাছাকাছি যেতেই দেখতে পেল সে-অঞ্চলে এবার একটি নতুন মেয়ের আবির্ভাব হয়েছে। মেয়েটি তার চেয়ে বয়সে

বাড়ী থেকে পালিয়ে

দু'-এক বছরের ছোট হলেও অত বড় মেয়েকে কেবল ফ্রক্ প'রে বেড়াতে এর আগে কখনো দেখে নি। সে মেয়েটি একটি ছোট ছেলেকে হাত নেড়ে মাথা নেড়ে কি বোঝাচ্ছিল, তার ছোট্ট বেণীটি দুলছিল। সেই মেয়েটি, তার কথা বলার ভঙ্গী, তার মাথা-নাড়া, তার বেণীর দোলন—তার সমস্ত কাঞ্চন অবাক্ হয়ে দেখছিল।

তার বড় কৌতূহল হ'ল মেয়েটির সম্বন্ধে। খানিক বাদে সেই ছেলেটি যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন সে আর আত্মসম্বরণ করতে পারল না। তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, 'ঐ মেয়েটি কে ভাই ?'

ছেলেটি এক মুহূর্ত্ত তার দিকে একটু আশ্চর্য্য হয়ে তাকালে। তার পর অত্যন্ত বিরূপ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'হোয়াট ইজ ইয়োর নেম্ ?'

কাঞ্চন একটু ধাক্কা খেল, কিন্তু দমল না। সে কি ইংরিজি জানে না ? সেও ইংরিজিতে জবাব দিল, 'মাই নেম্ ইজ কাঞ্চন।'

ছেলেটি আবার জিজ্ঞেস করল, 'হোয়াট্ ক্লাশ ডু ইউ রিড্ ইন্ ?'

কাঞ্চনের কেমন ধারণা ছিল যে তার বয়সের অনুপাতে সে নীচু ক্লাসে পড়ে, সেইজন্য ক্লাসের পরিচয় দিতে তার স্বভাবতঃই অনিচ্ছা হ'ল। সে শুধু বল্লে—'আই. ডোণ্ট সে।'

'ইউ মাষ্ট সে।'

'নেভার্।'

দূর থেকে তাদের এই বিজাতীয় তর্কাতর্কি শুনে এবার সেই মেয়েটি এগিয়ে এল ; ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, 'কি হয়েছে রে ভোম্বল ?'

মেয়েটির সাম্‌নে কাঞ্চনের বুক ঢিপ ঢিপ কর্‌তে লাগল। এ রকম তার কখনো করে না, এমন কি দুর্দ্ধর্ষ মাষ্টার মশায়ের সাম্‌নেও না। কাঞ্চনের মনে হ'ল এ রকম বিপদে সে কখনো পড়ে নি।

ভোম্বল বল্লে, 'মিনিদি, দেখ না এই ছেলেটা। আমি জিজ্ঞাসা করছি কোন্ ক্লাসে পড় ? যেন মার্‌তে আস্‌ছে। বল্‌ছে আই ডোণ্ট সে—কিছুতেই বল্‌বে না।'

মিনিদি বল্লে, 'আচ্ছা, আমি পরীক্ষা করছি, দাঁড়া। এই, বানান করো দেখি মেন্‌টেন্। ভোম্বল, জানিস্, এটা ভারী শক্ত বানান্, ছোড়দা আমায় ঠকিয়েছিল।'

মে ন্ টে ন্! ভারী শক্ত! কাঞ্চনের কাছে এ বানান্ অতি তুচ্ছ! ডায়ারিয়া, নিউমোনিয়া, থাইসিস্ কিংবা আরকিপিলেগো হ'লে বরং কথা ছিল। নাঃ, মেয়েটির কাছে তার বিদ্যার পরিচয় একটু দিতে হ'ল।

'মেন্‌টেন্? এম্-ই-এন্-টি-ই-এন্—মেন্‌টেন্।'

মুখ টিপে মিনি জিজ্ঞাসা করল, 'মানে?'

'মানে? দশ জন মানুষ।'

এবার মিনি হেসে ফেল্‌ল—'তোমার মাথা!'

কাঞ্চন বল্লে—'আহা, দশ জন মানুষ না হয়ে হ'ল গিয়ে মানুষ দশ জন—মেন-টেন ও একই কথা।'

মিনি বল্লে—'তোমার মুণ্ডু! মেন্-টেন্ হচ্ছে এম্-এ-আই-এন্-টি-এ-আই-এন্। এর মানে প্রতিপালন করা। এও জান না তুমি?'

এবার কাঞ্চন মোরিয়া হয়ে উঠল। তাকে অপদস্থ করার জন্য মেয়েটার ওপর ভারী রাগ হ'ল। সে জিজ্ঞাসা করল—'আচ্ছা, তুমি বানান্ কর দেখি—শূর্পনখা?'

মেয়েটি একটু ভুরু কুঁচকে ভাবলে। 'শূর্পনখা? ভোম্বল, কি স জানিস্? দন্ত্য স, না মধ্যণ্য ষ?' ভোম্বল ঘাড় নেড়ে জানাল সে জানে না।

'কি 'উ'? হ্রস্ব উ, না দীর্ঘ ঊ?' ভোম্বল আবার ঘার নাড়ল।

মেয়েটি কাঞ্চনকে বল্লে, 'বল্‌ছি, দাঁড়াও। দন্ত্য স-য়ে হ্রস্ব উ, প-য়ে রেফ স্থর্প, ন আর খ-য়ে আকার—সুর্পনখা।'

কাঞ্চন বল্লে, 'তোমার মাথা। নিজের নাম বানান্ জান না, আবার পরীক্ষা করতে এসেছ!'

এবার মেয়েটি রেগে গেল। 'কী? আমার নাম শূর্পনখা? তুমি তবে ঘটোৎকচ। ঘটোৎকচের বানান জান ত?'

বাড়ী থেকে পালিয়ে

ভোম্বলের এবার ভারী স্ফূর্তি! সে "ঘটোৎকচ" ব'লে হাত তালি দিতে লাগল।

. কাঞ্চন গম্ভীর হয়ে বল্লে' 'ঘটোৎকচ হ'তে পারি, কিন্তু সিংহের মামা ত নই। সিংহের মামা ত একটা জানোয়ার।'

মিনি বল্লে, 'সিংহের মামা আবার কে?'

'কেন, এই যে তোমার পাশে, ভোম্বলদাস!'

এ কথায় মিনিকে হাসতে দেখে ভোম্বল অত্যন্ত মুষড়ে গেল। সে বলল, 'আমার নাম বুঝি ভোম্বল? আমার নাম ত সুপ্রকাশ। ছোড়দা, ও ছোড়দা!'

একটি বছর কুড়ি- বাইশের ছেলে ওপার দিয়ে যাচ্ছিল। সে দূর থেকেই জবাব দিল, 'দাঁড়া, দাদার বিয়েটা কত দূর দেখে আসি।'

ভোম্বল হেঁকে বল্ল, 'দেখ না ছোড়দা, এই ছেলেটা আমাদের অপমান করছে।'

অপমানের কথা শুনে ছোড়দা এগিয়ে এল। মিনিকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'তোরা কি করছিস্ এর সঙ্গে?'

ভোম্বল জবাব দিল, 'মিনিদি শুধু ওকে বলেছে মেন্‌টেন্ বানান কর দেখি, তা ও যা বল্‌ছে। তুমি ওকে একবার এগ্‌জামিন্ কর না, ছোড়দা?'

অপরকে পরীক্ষিত হ'তে দেখ্‌লে ভোম্বলের ভারী আমোদ হয়। তা ছাড়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এগ্‌জামিন্ করায় ছোড়দার কি রকম আগ্রহ তা সে জানে।

ছোড়দা বল্লে, 'বটে? তোমার নাম কি বাপু?'

কাঞ্চনের অপ্রসন্ন মুখে জবাব দিল, 'কাঞ্চন।'

'কাঞ্চনের ইংরিজি কি?'

কাঞ্চন গুম্ হয়ে রইল, কোন উত্তর দিল না।

'কাঞ্চনের ইংরিজি হচ্ছে গোল্‌ড, তাও জান না? সাহসীর ইংরিজি বোল্‌ড্। ঠাণ্ডার ইংরিজি—কোল্‌ড্। বলিয়াছিলর ইংরিজি—টোল্‌ড্। পুরাতনের ইংরিজি—ওল্‌ড্। তৈরী করার ইংরিজি—মোল্‌ড্। বিক্রীত-র ইংরিজি—সোল্‌ড্। ধরে থাকার ইংরিজি—হোল্‌ড্। নাঃ, তুমি কিচ্ছু জান না!' কাঞ্চন নীরব।

''আচ্ছা, ট্রান্স্‌লেট কর, 'আমার একটা গাধা ছিল'। লজ্জা কি? ব'লে ফেল।' কাঞ্চন তবু কিছু বলে না।

'ভয় কিসের ? ব'লে কেন। ভয় নেই।'

এবার কাঞ্চনের আত্মসম্মানে আঘাত লাগ্ল। ভয় ? অমন যে অঙ্কের মাষ্টার মশাই, অমন যে সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাই তাকেই সে ভয় করে না, আর সে ভয় করবে এই—

কাঞ্চন গর্ব্বের সঙ্গে বল্ল, 'ভারি ত' ট্রান্স্লেসন্! আই ওয়াজ্ এ ঘ্যাস্।'

ছোড়দা ভারী হাস্তে লাগল। কাঞ্চন সংশোধন ক'রে বল্ল, 'আই ওয়াজ্ য়্যান্ য়্যাস্ ?'

ছোড়দা তবুও হাসে। কাঞ্চন অপ্রতিভ হ'য়ে বল্ল, 'কেন, ভুলটা হ'ল কোথায় ? পাষ্ট টেন্স্ তো দিয়েছি।'

ছোড়দা শুধু বল্ল, 'ওরে, তোরা কেউ এই গাধাটাকে চিড়িয়াখানায় দিয়ে আয়।' বলে মিনি ও ভোম্বলকে নিয়ে চলে গেল।

ভোম্বল যেতে যেতে বল্ল, 'ও কিন্তু ছোড়দা, মিনিদির কথা জিজ্ঞেস করছিল। বলছিল 'ও মেয়েটা কে ?' তাতেই ত আমার রাগ হয়ে গেল।'

ছোড়দা বল্লে, 'তাই নাকি ? মিনির কথা জিজ্ঞেস করছিল ? তবে বোধ হয় মিনিকে আমাদের ওর পছন্দ হয়েছে।'

মিনি শুধু বল্লে, 'দূর!'

ছোড়দা বল্লে, 'তা মন্দ কি! মিনি, ওকে যদি তোর বাহন করিস্ তা হ'লে তুই 'শীতলা ঠাকরুণ' হবি।'

মিনি দাদার পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিল।

বাড়ী থেকে পালিয়ে

এদিকে কাঞ্চন অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হয়ে এক কোণে বসে রইল। এত উৎসব, আনন্দ, কর্ম্ম-কোলাহল কিছুই তার আর ভাল লাগছিল না। মেয়েটির সামনে? ছি ছি! নাঃ, ইংরিজিটা তাকে ভাল করে শিখতেই হবে। হয়ত দু'-পাঁচ বছর বাদে ওই ছোড়দা আবার তার সঙ্গে লাগতে আসবে, কিন্তু তখন সে হেড মাষ্টারের মত ইংরিজি জানে; তখন তার কাছে বিদ্যে ফলানো সোজা নয়; তখন সে তাকে আচ্ছা জব্দ করে দেবে, ওই মিনির সামনেই। হাঁ।

কিন্তু বেশীক্ষণ মুখ চুপ ক'রে থাক্‌বার ছেলে সে নয়। যেমনি ঘোষণা হ'ল যে বামুনদের পাতা পড়েছে তৎক্ষণাৎ সে অদম্য উৎসাহে চঞ্চল হয়ে উঠল। একবার তার মনে হ'ল সে ত বামুন নয়! কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার মন জবাব দিল—না হোক্‌গে, খাওয়াটাই আসল, বামুন-টা নয়।

সে সটান্‌ বামুনের পংক্তিতে গিয়ে বসে পড়ল। নানা রকম তরি-তরকারি পাতে পড়তে লাগল। কাঞ্চন এক-একটু চেখে দেখল। তার পরে লুচি এল। ফুল্‌কো ছোট ছোট ময়দার লুচি—গুটি ছয়। সে ছ'খানা ত কাঞ্চনের এক নিঃশ্বাসে উড়ে গেল। তার পরে আবার প্রত্যেকের পাতে চারখানা করে পড়ল;—কাঞ্চনের দ্বিতীয় গ্রাস। তৃতীয় বারে জন প্রতি জিজ্ঞাসা করে লুচি দিচ্ছিল, অনেকেই বল্‌ল, 'আর না।' কাঞ্চন চুপ করে রইল, ফলে তার পাতে আর দু'খানা পড়ল। সে দু'খানা মরুভূমিতে জলবিন্দুর মত তৎক্ষণাৎ শুষে গেল। তার পরেই দই সন্দেশ এল। তার পর আর লুচি এল না।

কাঞ্চন মনে মনে বল্‌ল, 'দুত্তোর! এই কি না কলকাতার ভোজ!'

পাশের একজন ভদ্রলোক যখন বল্‌লেন, 'নাঃ, খাওয়াটা আজ বেজায় হয়ে গেল, অম্বল না হলে বাঁচি। একটা সোডা খেতে হবে।' তখন কাঞ্চন তাঁর ওপর দস্তুর মত রেগে গেল। ঐ নাম মাত্র আহার যেন ঘৃতাহুতি, কাঞ্চনের জঠরানল তার ফলে দ্বিগুণ জ্বলে উঠেছে।

কি করে বেচারা! সকলের সঙ্গে উঠে তাকেও আঁচাতে হ'ল। অবশেষে আবার ঘোষণা হ'ল, 'কায়স্থদের জায়গা হয়েছে।' তখন কাঞ্চনের আত্মাপুরুষ বলে উঠল, 'আমি ত কায়স্থ! এবার আমার ন্যায্য অধিকার, আমার বার্থ-রাইট্!' কাঞ্চন কায়স্থদের দলে গিয়ে দ্বিতীয়বার খেতে বসে গেল।

কাঞ্চন যখন দ্বিতীয়বার আঁচাচ্ছে তখন ভোম্বল মিনির দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বল্‌ল, 'দেখছিস্, ছেলেটা কি পেটুক, ভাই! একবার বামুনদের সঙ্গে খেয়ে আবার কায়স্থদের দলে—'

মিনি তাকে থামিয়ে দিল, 'যাঃ, বকিস্ নে—'

'কেন? আমি দেখেছি যে—'

'ওর শরীরখানা দেখেছিস্? কি রকম মাস্‌কিউলার? তোর মত পটকা নাকি? তোর মত তিনটেকে পিষে ফেল্‌বে। তোর তিনগুণ না খেলে ওর চল্‌বে কেন? কি রকম চওড়া বুক দেখেছিস্?

কথাটা কাঞ্চনের কানে গেল। শরীরের প্রশংসায় তার চওড়া বুক যেন আরো চওড়া হয়ে উঠল। নিরুৎসাহিত ভোম্বলের মলিন মুখের দিকে বিজয়গর্ব্বে সে একবার কটাক্ষপাত করল। তার পর কোনও দিকে দৃক্‌পাত না ক'রে গম্ভীর মুখে তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল— যেন স্বয়ং গামা কি গোবর!

তার কানে গেল ভোম্বলের প্রতিবাদ। সে বল্‌ছে, 'হ্যাঁ, ভারী ত বুক! অমন ঢের দেখেছি। ওকে এমন বক্সিংএর প্যাচ মারব যে বাছাধন—' বলে বক্সিংএর একটা প্যাচ মিনিকে সে দেখিয়ে দিল।

মিনি উত্তর দিল, 'থাঃ, তোকে আর বাহাদুরি করতে হবে না। তুই ত তুই! ছোড়দাও ওর সঙ্গে পারবে কি না—'

বাকি কথাটা কাঞ্চন শুনতে পেল না। তার আর শোনার দরকারও ছিল না। বিদ্যায় না হোক, অন্ততঃ গায়ের জোরে সে যে ছোড়দার সমকক্ষ এ কথা ভাবতে তার ভারী আরাম বোধ হ'ল। এবং এই ধারণা হচ্ছে মিনির—সেই মেয়েটির—যাকে বিয়েবাড়ীর সমস্ত মেয়ের মধ্যে তার পছন্দ হয়েছে।

যে ঘরে গানের আসর বসেছিল সেখানে তখনো তুমুল উদ্যমে গীতবাদ্য চল্‌ছে। হাত, পা, ও গলার একটানা কসরতে ভূতো বাবু তখনো কাহিল হন্ নি। কাঞ্চন মনে মনে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বড় দেয়াল-ঘড়িতে দেখলে—বারোটা বেজেছে। ঘড়ির অনুশাসনকে উপেক্ষা করা অনুচিত ব'লে তার মনে হ'ল। তৎক্ষণাৎ সে সেই বিস্তীর্ণ আসরের এক প্রান্তে লম্বা হয়ে পড়ল।

শুয়ে শুয়ে সে আজ সমস্ত দিনের কথা ভাবতে লাগ্‌ল। আজ বেলা দুপুরে সে বাড়ীতে ছিল, আজ রাত দুপুরে সে এখন কোথায়! সে যে কোথায়, কার বাড়ীতে সে নিজেই জানে না। সমস্ত দিনে কত কাণ্ডই না ঘট্‌ল! কিন্তু দৈহিক শক্তি কিছু থাকলেও চিন্তা-শক্তি কাঞ্চনের আদপেই ছিল না। খানিক বাদেই সে কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের

মহামারি আস্ফালনকে উপেক্ষা ক'রে ও সমস্ত দুর্ভাবনা ভুলে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল সে সত্যিই রাজা হয়েছে। অযোধ্যার নয়, কলকাতার। সোনার সিংহাসনে সে বসেছে! মণ্টু ঘুড়ি ওড়ানো, মার্বেল খেলা, লাট্টু ঘোরানো ইত্যাদি যাবতীয় জরুরি কাজ পরিত্যাগ ক'রে তার মাথায় ছাতা ধরেছে, আর ন্যাপলা—ওমা, তাই ত! সত্যিই যে ওর লেজ গজিয়েছে! সে বেচারা যথাসাধ্য গাল ফুলিয়ে তটস্থ হয়ে যোড়-হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার পাশে যে বসেছে, কাঞ্চন ভাল ক'রে ঠাহর ক'রে দেখলে সে মিনি ছাড়া আর কেউ নয়! কাঞ্চনের ভারী আনন্দ হ'ল।

কিন্তু কথায় বলে অত সুখ সয় না। কোথা থেকে সেখানে তার বাবা এসে হাজির। তাঁর হাতে সেই রূপোবাঁধানো ছড়ি—মালখানা থেকে সদ্য বহিষ্কৃত। নাঃ, আর রাজত্ব করা নিরাপদ নয়, এক লাফে সিংহাসন, মিনি, মণ্টু, ন্যাপলা সবাইকে ত্যাগ ক'রে কাঞ্চন দে ছুট—ছুট্—ছুট্—এক ছুটে একেবারে নিরুদ্দেশ।

কাঞ্চনের যখন ঘুম ভাঙল তখন বেশ একটু বেলা হয়েছে। বিস্তৃত ফরাস তখন প্রায় জনশূন্য। একজন বুড়ো লোক, সেই বাড়ীরই কোন কর্ম্মচারী—এক কোণে বসে একটা মোটা জাবদা খাতা নিয়ে বোধ করি হিসেবপত্র দেখছিলেন, কাঞ্চনকে জাগতে দেখে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাদের বাড়ীর তুমি?'

কাঞ্চন গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলে, 'আমাদের বাড়ীর।'

লোকটি একটু বিরক্ত হয়ে বল্লেন, 'তাতে কি বুঝব? যাই হোক্

তুমি কি বাড়ী চিনে যেতে পারবে? তোমার লোকজন বোধ হয় ভুলে তোমায় ছেড়ে চলে গেছেন। ঠিকানা বল্লে তাঁদের খবর দিতে পারতুম।'

কাঞ্চন বল্লে, 'কোন দরকার করে না। আমাকে কি আপনি পাড়াগেঁয়ে ভেবেছেন? কলকাতাতেই এত বড় হলুম আর কলকাতার পথ-ঘাট চিনি নে! আমি ঠিক যাব।'

কাঞ্চন চলে যাচ্ছিল, ভদ্রলোক ডেকে বল্লেন, 'ওহে ছোক্‌রা, তোমার চাদরটা ভুলে যাচ্ছ যে!'

কাঞ্চন দেখলে সে যেখানে শুয়েছিল তারি কাছে একটি চমৎকার সিল্কের চাদর পড়ে আছে। কোন ভদ্রলোক কাল ফেলে গেছেন কাঞ্চন বল্লে, 'না ও চাদর আমার নয়।'

এতক্ষণে ভদ্রলোকের মুখে হাসি দেখা গেল। তিনি বল্লে, 'তোমার নয়? ভাল। আমিও তাই ভাবছিলুম। তবে ওটা আমারই দাঁড়াল।'

কাঞ্চন ততক্ষণে বার হয়ে গেছে।

সাত

বাড়ীর বাইরে সদর দরজার ধারেই এঁটো-পাতা, গেলাস, খুরিতে স্তূপাকার। সেই স্তূপীকৃত জঙ্গলের পাশে মানুষ ও কুকুরের কোলাহল বেধে গেছে। চার-পাঁচজন ভিখারী আবর্জনা ঘেঁটে তার ভেতর থেকে ছেঁড়া লুচি, ভাঙা সন্দেশ, ভাজা পাঁপরের টুকরো, ডাল-তরকারীর অংশ ইত্যাদি সংগ্রহ ক'রে সঞ্চয় করছিল, কুকুরদের তাতে প্রবল আপত্তি। তারা এতক্ষণ দূর থেকে সমবেত প্রতিবাদ জানাচ্ছিল, কিন্তু তাদের সেই আন্দোলনে কোন ফল না হওয়ায় অবশেষে আক্রমণের উদ্যোগে ছিল, সেই সময়ে ভিখারীদের একজন কুকুরদের অগ্রগামী নেতাটিকে এক লাঠি বসিয়ে দিয়েছে। তার ফলেই কোলাহল।

কাঞ্চন আহত কুকুরের পক্ষ নিয়ে বললে, 'কাহে মার্‌তা ইস্‌কো ?'

যাকে সাধু ভাষায় বলে রোষকষায়িত নেত্র, ঠিক সেই চোখে ভিখারীরা কাঞ্চনের দিকে একবার কটাক্ষপাত করল। তাদের মধ্যে যে সব চেয়ে ছোট, কাঞ্চনের চেয়ে বয়সে কিছু বড়ই হবে, সে-ই সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'খানে আতা হায়।'

কাঞ্চন বল্ল, 'খায়ে গা নেহি ? কুকুরকা বাস্তে তো ফেক্ দিয়া।'

এইবার তাদের মধ্যে যে সব চেয়ে বড় সে কথা বললে ;— 'আদ্‌মিকো খানে নেই মিল্‌তা, কুত্তা খায়ে গা।'

কাঞ্চন অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুম্‌লোক এ লেকে কেয়া করে গা ?'

বাড়ী থেকে পালিয়ে

সেই ছোট ছেলেটি বল্লে, 'খায়ে গা।'

কাঞ্চন স্তব্ধ হয়ে গেল। সে ভাবতে লাগল—এত বড় সহর, এখানে এত বড়লোক, লোকের এত টাকা, এমন ভোজ, এমন শোভাযাত্রা, আর এখানে মানুষকে কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি ক'রে খেতে হয়! কাকে দয়া করবে—কার পক্ষে সে দাঁড়াবে? কুকুরের, না মানুষের?

সেই দৃশ্যের সম্মুখে সে আর একটুক্ষণও দাঁড়াতে পারল না। কাল রাত্রের সমস্ত খাওয়া যেন তার গলা দিয়ে ঠেলে আসতে লাগল। সেই সঙ্গে কান্নাও। সে ভাবতে ভাবতে চল্ল—কুকুরের মুখের গ্রাস কেড়ে এখানে মানুষকে বাঁচতে হয়! এ কেন—এ রকমটা কেন?

কেন যে এ রকমটা সে কিছুই ভেবে স্থির করতে পারল না। শেষে এই স্থির করল, সে বড় হ'লে কলকাতায় সমস্ত ভিখারীদের একটা বড় রকমের ভোজ দেবে। বড় হ'লে বড়লোক সে হবে নিশ্চয়ই, কেননা বড়লোক হতে দেরী হয় না, বড় হতেই যা দেরী। ভিখারীদের কি কি খাওয়াবে তারও একটা ফর্দ সে মনে মনে ঠিক ক'রে ফেলল।

আঃ, কালকে রাত্রের সেই ভোজটা! কম খাওয়াক্, কিন্তু কি চমৎকারই খাইয়েছে! অত সাদা লুচি তাদের পাড়া-গাঁয়ে হয় না। আর ক্ষীরটাই বা কি রকম—ক্ষীরের মধ্যে কেবল দুধের সর, সমস্তটার স্বাদই আলাদা! দইটাই বা কেমন মিষ্টি—তাদের গাঁয়ের দইয়ের মত অমন জোঁদা টক্ নয়—ওরকম দই সে অনায়াসে এক হাঁড়ি মেরে দিতে পারে। আর সন্দেশ! তাদের গাঁয়ের গাঙ্গুলীর দোকানের মণ্ডা—তা' দিয়ে আম পাড়া যায়! দেবী গাঙ্গুলী সাত জন্মেও এমন সন্দেশ করতে পারবে না। আঃ, কী তার সোয়াদ—এখনো যেন জিভে লেগে আছে।

হবেই ত। ওর দাম যে অনেক—কোনটাই চার পয়সার নীচে নয়—বোধ হয় আরো বেশী।

ভোজের কথা থেকে তার মিনির কথা মনে পড়ল। তার সঙ্গে দেখা ক'রে এলে হ'ত আজ। এখন ফিরে যাবে নাকি? সেই বুড়ো সরকারকে গিয়ে বলবে—'তোমাদের মিনিকে একবার ডেকে দাও না।' কিন্তু যা মেয়ে বাবা। এখনি এসে হয়তো জিজ্ঞেস করবে, 'ফিলাডেলফিয়া কোথায়? সাণ্ডোমিঙ্গো কোথায়? কোথায় মিসিসিপি?' কিংবা হয়তো বলবে, হিপোপটেমাস্ বানান কর।' তা' হ'লেই তো সে গেছে। মেয়েটির সব ভাল, কেবল ওই একটা বড় দোষ।

না, এখন মিনির সঙ্গে দেখা করাটা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। এখন মিনি কিছুতেই তাকে 'রেসপেক্ট' করবে না। না, সে বড় হয়ে এবং মিনির চেয়ে অনেক বেশী বিদ্বান্ হয়ে তার সঙ্গে দেখা করবে। মোটরে চেপে যাবে সে, গায়ে থাকবে সিল্কের পাঞ্জাবী, হাতে রিষ্ট-ওয়াচ, বুক পকেটে ফাউনটেন্ পেন্। মিনি তাকে চিন্তেই পারবে না! তখন সে বল্‌বে, 'তোমার বড়দার বিয়ের রাত্রে আমাকে দেখেছিলে।' তখনও যদি চিন্‌তে না পারে তা' হ'লে সেই লজ্জার কথাটা বল্‌তে হবে, 'তুমি যাকে মেন্‌টেন্ বানান্ করতে বলেছিলে গো!' তখন মিনি নিশ্চয়ই চিন্‌বে। সে মিনিকে বল্‌বে, 'এখন আমাকে বানান্ জিজ্ঞেস করতে চাও? আমি এখন এম্-এ পড়ি। অনেক মোটা মোটা শক্ত শক্ত বই আমাকে পড়তে হয়। তার মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত খবর, সব বিদ্যা আছে। তুমি কি জানতে চাও বল?' মিনি তখন লজ্জায় মুখ নীচু করে থাকবে। আর তার ছোড়দা? সে তখন সাত বার বি-এ ফেল্ ক'রে

বাড়ীতে বসে আছে। আর ভোম্বল? সে তার দাদার দশা দেখে কলেজে ভর্ত্তিই হয় নি।

একটা খবর-কাগজের হকার হেঁকে যাচ্ছিল—'মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—১৯২১ সনের মধ্যেই স্বরাজ দিব।'

কাঞ্চন ভাবলে—স্বরাজ আবার কি? মহাত্মা গান্ধীই বা কে? ডেকে জিজ্ঞেস করবে? ততক্ষণে হকার অনেক দূর চলে গেছে। স্বরাজ কি একটা বড় রকমের ভোজ-টোজ নাকি? মহাত্মা গান্ধী তাই বুঝি দেবেন! যদি মাসখানেকের মধ্যে পাকে তা'হ'লে ভোজটা সে খেয়েই বাড়ী ফিরতে পারবে। হকারের কাছে চেয়ে কাগজখানা দেখ্‌লে হ'ত, ওতে বোধ হয় সব লেখা আছে।

খানিক দূর গিয়ে কাঞ্চন দেখে—বাঃ একটা পুকুর যে! পুকুরের চার ধারে রাস্তা, রাস্তার ধারে ধারে আবার বেঞ্চি পাতা—সমস্ত জায়গাটা রেলিং দিয়ে ঘেরা। কাঞ্চন পুকুর দেখে ভারী খুসী হয়ে উঠ্‌ল। এতক্ষণ কেবল বাড়ী-ঘর দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখ যেন ক্ষয়ে যাচ্ছিল, অবশেষে অনেকখানি কালো জল দেখে যেন চোখ দু'টো জুড়োল. সে পুকুরের ধারে সিঁড়ির রোয়াকে গিয়ে বস্‌ল।

পুকুরের অন্য ধারে কতকগুলো ছেলে ড্রিল করছিল—কাঞ্চনের চেয়ে তারা বয়সে বড়। কুড়ি-বাইশ বছর ক'রে বয়স, এই রকম কাঞ্চনের মনে হ'ল। একজন মাষ্টার গোছের লোক তাদের ড্রিল শেখাচ্ছে।

কাঞ্চনের অদূরে বসে একজন হিন্দুস্থানী দাঁতন করছিল, কাঞ্চন তাকেই জিজ্ঞাসা কর্‌ল, 'এত সকালে ওরা ড্রিল করছে কেন? ওরা কারা?'

হিন্দুস্থানীটা উত্তর দিল, 'উ লোক্ হোল্‌টিয়ার হায় !'

হোল্‌টিয়ার কিরে বাবা ! ব্যাপারটা কাঞ্চনের কাছে কিছুমাত্র পরিষ্কার হ'ল না। সে জিজ্ঞাসা করলে, 'কোন্ ইস্কুলমে পড়্‌তা হায় ও লোক্ ?'

'ইস্কুল্‌মে ? উ লোক্ পঢ়াশুনা, ইস্কুল-কালিজ্ তামাম্ ছোড় দিয়া।'

পড়াশুনা, স্কুল-কলেজ সব ছেড়ে দিয়েছে ? ওদের আর বই মুখস্থ করতে হয় না, অঙ্কও কষতে হয় না ! বারে ! এত ভারী মজা ! কাঞ্চন ভাব্‌তে লাগ্‌ল সেও ড্রিলের খাতায় নাম লেখাবে নাকি।

অদূরে জলের মধ্যে হঠাৎ একটা ঘাই মারতে দেখে কাঞ্চন চম্‌কে উঠ্‌ল--পুকুরের মধ্যে কি আবার !

হিন্দুস্থানীটা কাঞ্চনের দিকে কৃপার চক্ষে তাকিয়ে বল্লে, 'মছলি।'

ওমা, তাই ত ! ইয়া ইয়া প্রকাণ্ড মাছ জলের তিন-চার সিঁড়ি নীচে অবলীলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। গিয়ে পাঁজাকোলা ক'রে একটা ধরলেই হয়। এত বড় পুকুরটা কি এম্‌নি মাছে বোঝাই ? কেউ কি এদের ধরে খায় না ? মাছগুলোর প্রাণে একটুও ভয় নেই ত ! এ রকম কেন ? ইত্যাদি প্রশ্ন কাঞ্চনের মুখে এল, সে হিন্দুস্থানীটাকে জিজ্ঞাসা করতে যাবে, দেখে সে তখন দাতন সমাধা ক'রে চলে যাচ্ছে। কি করে কাঞ্চন ? চুপ করে ভাবতে লাগল। মাছগুলো পুকুরের জলের মত কাঞ্চনের মনের তলদেশও যেন আলোড়িত করতে লাগল !

আট

কাঞ্চন খানিকক্ষণ সেই পুকুর-ধারে বসে হোলটিয়ার ও মাছদের ড্রিল্ দেখ্‌ল। তার পর সে ধীরে ধীরে সেখানে থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌ল। কিছু দূরেই একটা চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে চায়ের গন্ধ এসে কাঞ্চনের নাকে লাগ্‌ল। বাঃ, চমৎকার ত! কাঞ্চন মুখ তুলে দেখে সেই দোকানের টেবিলে একখানা খবরের কাগজ পড়ে আছে। এই খবরের কাগজ থেকে তো মহাত্মা গান্ধীর স্বরাজের ব্যাপারটা জেনে নেওয়া যায়। কাঞ্চন টেবিলের ধারে গিয়ে বসল।

বাঃ এ যে "বসুমতী" দেখ্‌ছি। এত ছোট কেন? তাদের বাড়ী কি হপ্তায় যে বসুমতী যায় সে তো এর চার ডবল। তার আধখানায় শুয়ে আধখানা চাদরের মত গায়ে ঢাকা দেওয়া যায়। সেই বসুমতী এত ছোট হয়ে গেছে! কাঞ্চন কিঞ্চিৎ দুঃখবোধ করল।

'চা দেব আপনাকে?'

কাঞ্চন মুখ তুলে দেখ্‌ল, দোকানের একটি চাকর তাকে সম্ভাষণ করছে। 'আপনি সম্ভাষণে সে অত্যন্ত বিগলিত হয়ে গেল। বললে, 'তা, দাও।'

'টোষ্ট্ দেব?'

'টোষ্ট্? তা দিতে পার।'

কাঞ্চন মনে মনে বললে—টোষ্ট্ আবার কি? কখনো তো কানে

শুনি নি! যাই হোক, খাদ্য নিশ্চয়ই। আর যা কিছু খাদ্য তা'তে কাঞ্চনের অরুচি নেই।

'দু'খানা টোষ্ট্ দিই তবে। আর মাম্‌লেট্?'

'মাম্‌লেট্?'

'মাম্‌লেট্ও হ'তে পারে, পোচ্ও হ'তে পারে—যা আপনি চান।' এ বলে কি! মাম্‌লেট্, আবার পোচ! এ রকম অদ্ভুত নাম কাঞ্চন কখনো শোনে নি। বল্‌ল, 'একটা মাম্‌লেট্ আর পোচ।'

কাঞ্চন কাগজের মধ্যে সেই দরকারী খবরটা খুঁজছে এ পাতা ও-পাতা ওল্‌টাচ্ছে, এমন সময়ে সেই লোকটি আবার জিজ্ঞেস কর্‌ল, 'আপনার টোষ্টে কি দেব? গোলমরিচ, না চিনি?'

কাঞ্চন গম্ভীরভাবে জবাব দিল, 'দুই-ই দাও।'

এতক্ষণে সেই খবরটি পাওয়া গেছে। ভেতরের একটা পাতার মাথাতেই বড় বড় অক্ষরে লেখা, 'মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন ১৯২১ সালের মধ্যেই স্বরাজ দিব।' খবরটা আনুপূর্ব্বিক পড়তে যাবে, এমন সময়ে, 'দেখি ভাই, কাগজখানা', ব'লে পাশের ভদ্রলোক কাঞ্চনের হাত থেকে কাগজখানা কেড়ে নিলেন।

কাঞ্চন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'স্বরাজ হলে কি হবে মশাই?

'তখন আমাদের কোন দুঃখ থাক্‌বে না।'

'স্বরাজ হ'লে সবার সুখ হবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'সবাই বেশ ভাল খাবে-দাবে? ভাল পোষাক পরবে?'

ভদ্রলোক একটু অবাক্ হয়ে কাঞ্চনের দিকে তাকালেন, তার পরে জোরের সঙ্গে বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

'আচ্ছা, গরীব মানুষদেরও স্বরাজ হবে ত? স্বরাজ হ'লে তারা ভাল খেতে পাবে, পরতে পাবে?'

'তার মানে?'

'গরীবদের আবর্জ্জনা ঘেঁটে আর পথের এঁটোকাটা কুড়িয়ে খেতে হবে না তো?'

ভদ্রলোক হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারলেন না, তিনি ঈষৎ ভাবিত হয়ে পড়লেন। কাঞ্চন পুনরায় প্রশ্ন করল, 'তা' হ'লে গরীব লোকেরাও তিনতালা-চারতালা বাড়ীতে বেশ আরামে বাস করতে পাবে তো?'

ভদ্রলোক বল্লেন, 'স্বরাজে এ সব হবে ব'লে আমার মনে হয় না। গরীবরা গরীবই থাকবে।'

কাঞ্চন বললে, 'মহাত্মা গান্ধী কে?'

ভদ্রলোক আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। 'সে কি মহাত্মা গান্ধীর নাম শোন নি?'

কাঞ্চন লজ্জার সহিত স্বীকার করল—নাম শুনেছে বটে, তবে ভদ্রলোকের সম্বন্ধে সে ভালমত কিছু জানে না। যে অজ পাড়াগাঁয়ে তাদের বাড়ী, সেখানে কোন খবরই বড় একটা পৌছায় না। হ্যাঁ, একখানা খবর-কাগজ সাতদিন অন্তর তাদের বাড়ী যায় বটে, কিন্তু তা বাবা নিজে পড়ে ফাইল ক'রে রাখেন। কাঞ্চনকে পড়তেও দেন্ না, সে পড়েও না। একবার তাদের স্কুলের ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড্ ক্লাসের ছেলেরা গাঁধীর হুজুক না কি নিয়ে মেতে উঠেছিল, তারা বলছিল বটে যে স্কুল

বয়কট করবে, কিন্তু সব ক্লাসের সব ছেলে জিনিষটা ভাল ক'রে বুঝবার আগেই হেডমাষ্টার মশাই এক মাসের লম্বা ছুটি দেওয়ায় ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায়।

কাঞ্চনের সমস্ত কথা শুনে ভদ্রলোক তখন তাকে গান্ধীজীর জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে বোঝাতে লাগলেন। কাঞ্চন অভিভূতের মত শুনতে লাগল।

গান্ধীজী রোজ মাত্র ছ'পয়সার খেয়ে থাকেন শুনে কাঞ্চন অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌ল, 'বলেন কি! মোটে ছ'পয়সা? কি খান্ তিনি?'

'কেবল ছাগলের দুধ। রোজ দেড় সের।'

'তা তো ছ'পয়সায় হবে না। দেড় সের ছাগলের দুধের দাম আমাদের গাঁয়ে দেড় টাকা।'

ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হয়ে বল্লেন, 'তা' হ'লে ওটা বাজে কথা হবে। আমি ওই রকম শুনেছিলাম।'

কাঞ্চন ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, 'না, বাজে কথা নয়, ঠিক হয়েছে। ছাগলকে ছ'পয়সার ঘাস খাওয়ান্। সেই ঘাসে দুধ হয় তো?'

ভদ্রলোক বল্লেন, 'তাই হবে তা' হ'লে। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও।'

গান্ধীজীর গল্প শোন্‌বার অবসরে অজ্ঞাতসারে কাঞ্চন টোষ্ট্, পোচ্, মাম্‌লেট ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করছিল। চায়ের কাপে এক চুমুক দিয়ে বল্‌লে, 'আঃ, ভারী গরম!'

ভদ্রলোক পেয়ালার গায়ে হাত দিয়ে বল্লেন, 'গরম কোথায়? এ তো জুড়িয়ে গেছে।'

'জুড়োয় নি এখনো, মুখ পুড়ে গেল।'

'তা হ'লে প্লেটে ঢেলে খাও।'

'খাচ্ছি। আমি শুধু ভাবছি গান্ধীজী এত কষ্ট ক'রে যে স্বরাজ আন্‌বেন তা কেবল বড়লোকের স্বরাজ হবে। গরীবের দুঃখ আর ঘুচ্‌বে না।'

'ক্রমশঃ ঘুচ্‌বে ক্রমশঃ।'

একটু পরে ভদ্রলোক বল্লেন, 'খাওয়া হয়েছে? চল এবার ওঠা যাক্?'

'হ্যাঁ, চলুন।'

ভদ্রলোক ও কাঞ্চন উঠ্‌তেই দোকানের লোকটি বল্লে, 'খোকাবাবু, আপনার দাম দিলেন না?'

কাঞ্চনের এতক্ষণে হুঁস হ'ল। সে বল্লে, 'দাম? এই যা, আমার কাছে তো একটিও পয়সা নেই! এই দেখ বলে শূন্য পকেটে হাত পুরে দিল। পকেটের শূন্যতা সম্বন্ধে তার মনে কোন সংশয় ছিল না, কেবল দোকানদারকে নিঃসন্দেহ করার জন্যই তার এই প্রয়াস।

কিন্তু নিঃসন্দেহ হয়ে দোকানদার নিরস্ত হ'ল না। বরং তার ব্যস্ততা যেন বেড়ে গেল। 'সে বল্লে, সে কি! তুমি যে অনেক খেয়েছ?'

'আপনি' থেকে 'তুমি'! কাঞ্চন ভারী চটে গেল। সে বল্লে, 'তুমি আমাকে খাওয়ালে কেন? আমি তো খেতে চাই নি। আমি তো খবর-কাগজ পড়তে এসেছিলুম।'

'শুন্‌ছেন বাবু, শুন্‌ছেন ছোঁড়ার কথা? উনি খেতে চান নি। আপনি তো আগাগোড়াই সব দেখ্‌ছেন—'

ভদ্রলোকের সাক্ষাতে কাঞ্চন এবার নিজেকে অপমানিত মনে করল। সে বল্লে, 'তা খেয়েছি তো কি হয়েছে? ধার থাক্‌ল তবে!'

'ধার থাক্‌ল! তোমাকে চিনি না, জানি না, তোমাকে ধার দেয় কে!'

'তা আর কি হবে, পয়সা নেই যখন! লিখে রেখে দাও। দেবী গাঙ্গুলীও লিখে রাখে।' ভদ্রলোক এতক্ষণে কথা বল্লেন, 'কত হয়েছে?'

দোকানদার বল্লে; 'দুখানা টোষ্ট, একটা পোচ, একটা মাম্‌লেট, এক কাপ চা—চার পয়সা, আর পাঁচ পয়সা—ন পয়সা, আর চার পয়সা হ'ল গিয়ে তের পয়সা, চায়ের তিন পয়সা—একুনে চার আনা।'

'এই নাও চার আনা। হ'ল তো?' পয়সা চুকিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক কাঞ্চনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাকে বল্লেন, 'কোথায় যাবে তুমি?'

কাঞ্চন বললে, 'কোথাও না।'

'এস তবে এই পার্কে খানিকক্ষণ ব'সে গল্প করা যাক্‌।'

নয়

কাঞ্চন একটু আগে যে পুকুরটা পরিত্যাগ ক'রে এসেছিল তারই ধারে তারা দু'জনে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বস্‌ল।

কাঞ্চন মনে মনে ভারী বিস্ময় বোধ করছিল। একজন অচেনা ছেলের জন্য এত বড় ত্যাগ স্বীকার করতে এর আগে সে কাউকে দেখে নি। ত্যাগীর আসনে ভদ্রলোককে গান্ধীজীর ঠিক পরেই সে সে স্থান দিল। এক কথায় একেবারে চার আনা! চার আনা কম পয়সা নয়। ষোল দিনে জমে! বাবা রোজ একটি ক'রে পয়সা তাকে দেন, সে তাই মার কাছে জমায়। অনেকগুলো জমলে তাই দিয়ে তখন ঘুড়ি-লাটাই কিংবা ছিপ-হুইল্ ইত্যাদি কেনে।

সে এখন বড় হয়েছে, এই অজুহাত দেখিয়ে সে একবার বাবার কাছে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল যে এক পয়সায় তার আর চলে না, ওটা দু'পয়সা করা হোক্। বাবা তার বড়ত্বে বিশ্বাস করলেন কিনা ঠিক বোঝা না গেলেও বরাদ্দটা বাড়িয়ে দিতে তার বিশেষ আপত্তি দেখা গেল। বাবা বল্লেন, 'এইখানে সাত হাত মাটি খোঁড়্ দেখি, পাবি একটা পয়সা? পয়সা অমনি আসে?'

পয়সা যে সস্তা নয় এ বিষয়ে সে বাবার সঙ্গে এক মত হতে পারে না, কেননা পয়সার্ যা কিছু দুর্লভতা সে কেবল তার তরফেই; তার বাবার বেলায় সেই পয়সাই অজস্র ভাবে অমনি অমনি আসে।

সে বাবাকে উত্তর দিয়েছিল, 'এখানে মাটি খুঁড়লে পয়সা পাব না

বটে, কিন্তু কূপ খুঁড়লে হাত পিছু ছ'আনা ক'রে পাব। অনাদি পরাণ মণ্ডলের বাড়ী কূপ খোড়ে, সে পায়।'

ছেলেকে পরাণ মণ্ডলের বাড়ী কূপ খুঁড়তে উৎসাহিত করতে বাবা চান্ না, তাই মাটি খোড়ার উপমাটা আর তিনি দেন না। আজকাল বলেন, 'পয়সা কি গাছে ধরে যে নাড়লেই টুপ্ টাপ্ পড়বে?'

কাঞ্চন হঠবার ছেলে নয়। সে জবাব দেয়, 'গাছ নাড়লে ফল তো পড়বে, সেই ফল বেচ্‌লে পয়সা।'

বাবা বিরক্ত হয়ে বলেন, 'তবে তাই নাড়ো গে।'

কাঞ্চন অগত্যা চলে যায়, কিন্তু কোন গাছের কাছে নয়। কাছাকাছি বিস্তর গাছ থাক্‌লেও তাদের দিকে চেয়ে কোন আশ্বাসই সে পায় না। গাছের বদলে সে মাকে গিয়ে নাড়া দেয়।

•

পুকুরের অন্য ধারে তখনো ড্রিল চল্‌ছিল। কাঞ্চন জিজ্ঞেস করল, 'ওরা সব হোল্‌টিয়ার,—নয় কি?

'হোল্‌টিয়ার আবার কি? ওরা সব সি, আর, দাশের ভলান্টিয়ার।'

একটু ইতস্ততঃ ক'রে কাঞ্চন বল্‌লে, 'সি, আর, দাশ কে?'

'সি, আর, দাশকেও জান না বুঝি?'

কাঞ্চন লজ্জায় চুপ করে রইল। ভদ্রলোক বল্লেন, 'গান্ধীজী যেমন সমস্ত ভারতবর্ষের, সি, আর, দাশ তেমনি এই গোটা বাংলাদেশের। তাঁর পুরো নাম হচ্ছে চিত্তরঞ্জন দাশ। খুব বড় ব্যারিষ্টার—মাসে ওঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়। দেশের জন্য সমস্ত ছেড়েছেন। গান্ধীজীর চেয়েও ওঁর ত্যাগ বড়। ওঁর মত বিলাসী লোক বাংলায় ছিল না,

বাড়ী থেকে পালিয়ে

'আমাকে যদি না পাও, তোমার মত কোন ছোট ছেলেকে সাহায্য ক'রো তখন, তা হ'লেই আমাকে শোধ করা হবে। এই আমার কার্ড, এতে আমার নাম-ঠিকানা আছে। যদি কখনো অসুবিধায় পড়, লোকের কাছে পথ জেনে আমার কাছে এস। এখান থেকে বেশী দূর নয়। আমি এখন আসি?'

ভদ্রলোক চলে গেলেন। কাঞ্চন বিস্মিতভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল। একবার মনে হ'ল ভদ্রলোকের সঙ্গে গিয়ে তার বাড়ী দেখে আসে। আবার ভাবল, কি জানি, তা' হ'লে হয়ত রাগ করবেন। ভদ্রলোককে তার ভারী ভাল লেগে গেল। দেশের জন্য সর্ব্বস্ব দেওয়া তো তার পক্ষে কিছুই না, বোধ হয় ঐ ভদ্রলোকটির জন্যও সে সর্ব্বস্ব দিতে পারে। কাঞ্চনও পার্ক থেকে বেরিয়ে প্যারেডের দলে গিয়ে ভিড়ে গেল—তাদের সবার শেষে।

দশ

ভলাণ্টিয়ারদের সঙ্গে সমস্ত সহর ঘুরে ঘুরে কাঞ্চনের পা ধ'রে গেল আর গলা গেল ভেঙে।

সকাল বেলার দিকে যখন প্যারেড্ সুরু হয় তখন তার এমন ভাল লাগছিল! লেফ্ট্—রাইট্—লেফ্ট্—তালে তালে পা ফেলে চলতে কী চমৎকার!

কিন্তু এখন মাথার ওপরে সূয্যি, রোদ্দুর ঝাঁঝাঁ—সহরের রাস্তা এমন তেতে উঠেছে! কাঞ্চনের এখন মনে হচ্ছে ধ্যুত্তোর! আর কাঁহাতক ঘোরা যায়? এখন এক থালা ভাতের সম্মুখে গিয়ে বসতে পারলে হয়! খেয়ে-দেয়ে বিকেলে, রোদ্দুর পড়লে, আবার না হয় একচোট লাগা যাবে।

আরো অনেকক্ষণ টহল দিয়ে অবশেষে তারা একটা পার্কের পাশে এসে দাঁড়াল। পার্কের ওপরেই চারতালা প্রকাণ্ড বাড়ী—দেখেই কাঞ্চন বুঝতে পারল এই বাড়ীটাই তাদের আস্তানা। তারি সম্মুখে এসে ক্যাপ্টেন হুকুম দিলেন—'হল্ট্!' তারা দাঁড়াল।

'নাম্বার!'

'ওয়ান্—টু—থ্রি—ফোর্—ফাইভ্—সিক্স্—সেভ্ন্—এইট্—'

ভলাণ্টিয়াররা নম্বর ব'লে চল্ল। কাঞ্চনের কোন নম্বর ছিল না, সে চুপ ক'রে রইল। ক্যাপ্টেন্ প্রশ্ন করলেন, 'এ ছেলেটি কে?' ভলাণ্টিয়ারদের একজন জবাব দিলে, 'ও আমাদের নয়।'

বাড়ী থেকে পালিয়ে

লোহার রেলিং দেওয়া গেট্—ঝনাৎ করে খুলে গেল। ক্যাপ্‌টেন্ তাঁর ভলান্টিয়ারদের নিয়ে মার্চ্চ করে ভেতরে চলে গেলেন। গেট্ আবার ঝনাৎ ক'রে বন্ধ হয়ে গেল।

কাঞ্চন বাইরে দাঁড়িয়ে গেটের গরাদের ফাঁক দিয়ে ভেতরের লোকজনদের দেখতে লাগ্‌ল। ভলান্টিয়াররা জুতো-জামা খুলে ফেলে প্রকাণ্ড চৌবাচ্চার ধারে দাঁড়িয়ে স্নান করছিল। অনেকক্ষণ থেকেই কাঞ্চনের গলা শুকিয়ে এসেছে—এক গেলাস জল কেউ দেয় না? সাহস ক'রে চাইবে? ওদের স্নান করা দেখে তার সমস্ত শরীর যেন তৃষিত হয়ে উঠ্‌ল।

খানিক বাদে সারি সারি কলাপাতা পড়ে গেল। ভলান্টিয়াররা খেতে বস্‌ল। আঃ, ডালটার কী চমৎকার গন্ধ! ভাত কোনদিনই তার মুখে রোচে না, ভাতের চেয়ে খেজুর-গুড়ের পাটালী দিয়ে চিঁড়ে ঢের ভাল। কিন্তু সেই ভাতই যে কত আকর্ষণের বস্তু আজ সে প্রথম অনুভব করছিল। আঃ, কেউ যদি তাকে একবারটি খেতে বলে। জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি খেয়েছে?' কিংবা 'তুমি কি খাবে?'

কিন্তু সে রকম প্রয়োজনীয় প্রশ্ন কেউই তাকে করল না। একজন আধ-বয়সী ভদ্রলোক ওপর থেকে নেমে এলেন। তৎক্ষণাৎ ওপারের দরজা খুলে একখানা মোটর বেরিয়ে এল। তিনি সেই মোটরে উঠে বসলেন।

ইনি বোধ হয় সি, আর, দাশের দলের একজন হোম্‌রা-চোম্‌রা কেউ হবেন! হয়তো স্বয়ং তিনিই হ'তে পারেন! এঁরও তো পরনে মোটা খদ্দর!. লোকটিকে দেখলে ভক্তি হয়। কাঞ্চন তাঁর কাছে গিয়ে ডাকল, 'মশাই, ও মশাই?'

বাড়ী থেকে পালিয়ে

মোটর থেকে মুখ বাড়িয়ে ভদ্রলোক কাঞ্চনকে দেখলেন। কাঞ্চন বল্লে, 'আপনি কি—আপনি কি সি, আর, দাশ?' ভদ্রলোক একগাল হেসে বল্লেন, 'না, না। তুমি কি দাশ মশাইকে দেখ নি? আমি তাঁর দলের একজন। তোমার কি চাই?'

কাঞ্চন বল্লে, 'আমি ভলান্টিয়ার হব।'

ভদ্রলোক কাঞ্চনকে ভাল ক'রে একবার দেখে নিয়ে বল্লেন, 'আমরা আঠারো বছরের নীচে তো ভলান্টিয়ার করি না। তুমি যে বড্ড ছেলেমানুষ!'

'কিন্তু আমি দেশের জন্য সর্ব্বস্ব দিতে পারি।'

ভদ্রলোক হেসে বল্লেন, 'বড় হয়ে বরং দিয়ো।' তার পরই মোটর ছেড়ে দিলে।

কাঞ্চন দেখ্‌লে, হৃদয়ের ততটা দাম নেই, যতটা দাম বড় হওয়ার। কোনগতিকে এক নিঃশ্বাসে বড় হওয়া যায় না? কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি দেখে যে সে হঠাৎ খুব বড় হয়ে গেছে! ছেলেদের ওপর ভগবানের কি অবিচার দেখ তো! কিছুতেই তাদের তাড়াতাড়ি বড় হ'তে দেন না। মনে মনে এইরূপ নানা রকম দার্শনিক আলোচনা করতে করতে কাঞ্চন পার্কের ভেতরে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল।

পার্কের অন্য ধারে টেবিল-চেয়ার সাজানো হচ্ছিল। কাঞ্চন ভাবতে লাগ্‌ল—মাঠের মধ্যে টেবিল-চেয়ার,ব্যাপার কি? ক্লাস বসবে নাকি? অত্যন্ত ইচ্ছে ব্যাপারখানা গিয়ে জানে, কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণায় এবং পরিশ্রমে এতটা অবসন্ন যে উঠবার উৎসাহ তার আদৌ ছিল না। যাই হোক্‌ গে—বসে বসেই দেখা যাবে এখন!

খানিক বাদে একটা কনেষ্টবল এসে তার পাশে বস্‌ল। একটু পরেই সে মোটা গলায় গান ছেড়ে দিলে—

"নৌতুন গাসে নৌতুন নৌতুন ফুল ফুটিয়েসে!
আরে—নৌতুন গাসে—"

পাহারাওয়ালায় গান গায়! এই অদ্ভুত দৃশ্যে কাঞ্চনের অত্যন্ত হাসি পেল। হাসি চেপে সে গম্ভীর ভাবে বল্লে, 'বাঃ, পাহারাওয়ালা সাহেব, তুমি তো বেশ বাংলা গান গাইছ!'

পাহারাওয়ালা গর্ব্বের সহিত বল্লে, 'হামি আঠ বরেষ বাংলা মুলুকে আসে—বহুৎ বাংলা শিখিয়েসে। হামার হিন্দীমে ভি আচ্ছা গানা আছেন কিন্তু বাংলা গানাই হামি ভালোবাসে। আরে নৌতুন গাসে নৌতুন নৌতুন—'

পার্কের দূরবর্ত্তী এক দরজা দিয়ে একদল কনেষ্টবল প্রবেশ করল। তাদের আবির্ভাব দেখে এই পাহারাওয়ালার সঙ্গীতচর্চ্চা অকস্মাৎ থেমে গেল।

কাঞ্চনও উঠে পার্ক থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল।

কিন্তু নাঃ, তার কিছু খাওয়া দরকার। যা খিদে পেয়েছে! পকেটের সিকিটাকে নাড়তে নাড়তে সে একটা খাবারের দোকানের অন্বেষণে চল্‌ল। আহা, সেই লোকটার সন্দেশের দোকান যদি কাছাকাছি কোথাও হয়! কিন্তু চার আনায় ক'টাই বা হবে? তার সন্দেশের ভারী দাম—কোনটাই চার পয়সার নীচে নয়! আহা দেবী গাঙ্গুলীর দোকানে কি সস্তা! চার আনায় আধসের রসগোল্লা! কেমন বড় বড় শক্ত, তা খাওয়াও চলে আবার তা দিয়ে মানুষ মারাও চলে! চার আনার খেলে চার দিন মনে থাকে।

এগার

দেবী গাঙ্গুলীর রসগোল্লার কথা মনে হতেই কাঞ্চনের জিভে জল এল। বাবা কিন্তু দেবীকে বড় ঠাট্টা করেন। সেবার কালীপূজোর সময়ে বলেছিলেন, 'দেখ দেবী, মাঝে মাঝে একটু রকমফের কোরো। তোমার যা গোল্লা, ও গোলা-বিশেষ—দুর্ভিক্ষে আর রাষ্ট্রবিপ্লবে কাজে লাগ্‌তে পারে কিন্তু ভদ্রলোকের পাতে—!' ব'লে কথাটা শেষ না করেই বাবা যা হেসেছিলেন! এ কথায় হাসবার কি আছে কাঞ্চন ত খুঁজে পায় না। বাবার যেমন!

"জগদ্ধাত্রী ভোজনাশ্রম"

চল্‌তে চল্‌তে আচম্‌কা ওই কথাগুলো দেখে কাঞ্চন থম্‌কে দাঁড়াল। মন দিয়ে সাইন্‌-বোর্ড্‌টা পড়তে লাগ্‌ল, "এই যে আসুন! এখানে উৎকৃষ্ট ভাত, ডাল, তরকারী, মাছের ঝোল, ঝাল, অম্বল ইত্যাদি দিবারাত্র পাওয়া যায়।"

বাঃ, এই ত সে খুঁজছিল! কাঞ্চন আর ক্ষণমাত্র ইতস্ততঃ না করে সটান্ ভেতরে ঢুকে গেল। 'কত? তোমাদের এখানে খেতে ক' পয়সা?'

'তিন আনা। কই, পয়সা দেখি?'

'দেব, আগে খাই।'

'ও সব হবেক নাই বাপু—' ব'লে আশ্রমের মালিক বিড় বিড় করে বক্‌তে শুরু কর্‌ল; তার মোদ্দা কথাটা এই যে, ছেলেছোক্‌রাদের এই

ভাবে খাইয়ে অনেকবার সে ঠকেছে, আগে হাতে পয়সা নিয়ে তবে—, ধারে সে খাওয়ায় না।

কাঞ্চন তাকে সিকিটা দিয়ে একটা আনি ফেরৎ নিল। লোকটার বক্তৃতায় সে মনে মনে ভারী বিরক্ত হয়েছিল। আগে ত খেয়ে নিক্, তার পরে দেখাবে লোকটাকে। ঘরের মধ্যে পছন্দমত ভাল একটা জায়গা বেছে নিয়ে সে বসে পড়্ল। বস্তে না বস্তেই একজন মোটাসোটা ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন।—'ওহে ছোক্রা, ওখানে বস্লে যে? ওটা যে আমার জায়গা!'

কাঞ্চন ভদ্রলোকের দিকে একবার তাকাল মাত্র, কোন বাঙ্নিষ্পত্তি কর্‌ল না।

'এ যে নড়েও না, রাও কাড়ে না! ও কিত্তিবাস—কিত্তিবাস!'

আশ্রমের মালিক কৃত্তিবাস উপস্থিত হয়ে সমস্যাটা আগে বুঝে নিল, তার পরে কাঞ্চনকে বল্ল, 'তুমি একটু সরে বস বাপু, ইনি আমাদের বাঁধা খদ্দের—'

'বাঁধা খদ্দের ত অন্য কোথাও বেঁধে রাখ গে। আমি নড়ছি নে।'

ততক্ষণে কাঞ্চনের সম্মুখে ভাতের থালা এসে পৌছেছে। কৃত্তিবাস চটে বল্লে, 'তুমি থালাটা নিয়ে ওই ধারে বস না কেন?'

'পয়সার বেলা নগদ, আর বস্বার বেলা ধারে? তা হবে না।' এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে কাঞ্চন আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে থালার প্রতি মনোনিবেশ কর্‌ল। অগত্যা ভদ্রলোক কাঞ্চনের দিকে কট্মট্ করে চাইতে চাইতে নিজেই অন্য জায়গায় গিয়ে বস্লেন।

খাওয়া-দাওয়া সেরে কাঞ্চন বেরিয়ে পড়্ল। বারোটা পয়সা

নিয়েছে বটে তবে নেহাৎ মন্দ খাওয়ায় নি। যাক্ গে বেটা, কাঞ্চন ওকে মনে মনে মার্জ্জনা ক'রে দিল।

'ভোজনাশ্রমের' পাশেই একটা ওষুধের দোকান—বড় বড় হরফে ইংরেজিতে লেখা Chemist and Druggist। দোকানের টেবিলে কাঞ্চন দেখ্‌ল, সকাল-বেলার সেই কাগজখানার মত একখানা কাগজ। আজ্‌কের খবরটা তো তার পড়া হয় নি। একবার পড়ে দেখ্‌লে হ'ত।

সে আস্তে আস্তে দোকানে ঢুকল। টেবিলের ধারে সাহেবী পোষাক পরা অল্পবয়সী একজন ভদ্রলোক বসে-ছিলেন, তিনি খবর-কাগজ থেকে চোখ তুলে তাকালেন। কাঞ্চন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি ডাক্তার?'

'হ্যাঁ' কি চাই?'

'ওই কাগজখানা একবারটি পড়ব!'

'পড়তে পার।'

'কাগজখানা পড়তে গেলে ওষুধ কিন্‌তে হবে না ত? আমি আগেই বলে দিচ্ছি মশাই, আমার কাছে পয়সা-টয়সা নেই, ওষুধ কিন্‌তে আমি পারব না।'

ডাক্তার বিস্মিত ভাবে বল্লেন, 'না না, ওষুধ কিন্তে হবে কেন ? কিছু না কিনেই তুমি পড়তে পার।'

ডাক্তার এতক্ষণ একটু অবাক্ হয়ে কাঞ্চনকে লক্ষ্য করছিলেন, কাগজখানা তার পড়া শেষ হলে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন্ স্কুলে পড় তুমি ? কোন্ ক্লাসে ?'

কাঞ্চন গর্ব্বের সহিত বল্ল, 'আমি পড়ি টড়ি না।'

'এত বড় ছেলে, স্কুলে পড় না! কি রকম ?'

'পড়তুম। স্বরাজের জন্য ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছি।'

'বটে ? মুখ্যু হয়ে থাক্‌লে স্বরাজ হবে ?'

কাঞ্চন প্রশ্নের ধাক্কায় প্রথমটা কাবু হয়ে পড়্‌ল, কি জবাব দেবে ভেবে পেল না, কিন্তু একটু পরেই দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিল, 'নিশ্চয়! মহাত্মা গান্ধী বলেছেন—বলেছেন—স্বরাজ মে ওয়েট্ বাট্—বাট্—কথাটা আমার এখন মনে আসছে না। তার মানেটা এই যে, পড়াশুনার জন্য অপেক্ষা করা চল্‌বে কিন্তু স্বরাজের জন্য আর অপেক্ষা করা চলবে না। বুঝেছেন ?'

ডাক্তার হেসে বল্লেন, 'মহাত্মা গান্ধী কোথাও এ কথা বলেন নি। ওই ত তোমার সম্মুখে কাগজ পড়ে আছে, কোথায় বলেছেন দেখাও দেখি? মহাত্মা গান্ধী নিজে কি মুখ্যু? সি, আর, দাশ কি মুখ্যু? ওঁদের মত অত বড় বিদ্বান্ দেশে খুব কমই আছে, তা জান?' কাঞ্চন এবার নিরস্ত্র হয়ে পড়্‌ল।

ডাক্তার বলে চল্লেন, 'মূর্খতার দ্বারা যদি স্বরাজ হ'ত তা হলে দেশের ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে উনত্রিশ কোটিই তো আকাট্, কোন্ দিন স্বরাজ হয়ে যেত তবে! মুখ্যু হয়ে থাক্‌লে ভাত আসে না,—স্বরাজ আসে?'

কাঞ্চন কি বল্‌তে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে ডাক্তার বল্লেন, 'তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাই না। খবরের কাগজ পড়ে পড়ে তোমার মাথা বিগ্‌ড়েছে। যাও, এখুনি ইস্কুলে আবার ভর্ত্তি হও গে, ভর্ত্তি হয়ে তবে অন্য কথা। যাও—এক্ষুণি যাও—যাঃও।'

ভদ্রলোক যেন কাঞ্চনকে তাড়া করলেন। চম্‌কে উঠে কাঞ্চন চেয়ার ছেড়ে এক লাফে একেবারে ফুটপাথে।

কিন্তু ফুটপাথে পড়েই তার মনে হল—ছি:! পালানোটা কাপুরুষের লক্ষণ। কাঞ্চনের কোষ্ঠিতে কাপুরুষতা লেখে না। সে তৎক্ষণাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বল্ল, 'পড়্‌ব না আমি। আপনি কি করবেন? আমি ভয় করি নাকি আপনাকে?'

ডাক্তার হো হো করে হাস্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর হাসিতে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে কাঞ্চন সে স্থান পরিত্যাগ করল। পরিত্যাগ করল বটে, কিন্তু ভয় পেয়ে নয় বীরের মত।

কিন্তু বড় ভাবনায় পড়ে গেল কাঞ্চন। মহাত্মা গান্ধী নাই বলুন, না হয় অন্য কেউই বলেছে, তা বলেই তো কথাটা মিথ্যে হতে পারে না। কিন্তু এ ভদ্রলোক যা বল্লেন সে কথাগুলোও তো ফেল্না নয়! তবে? উল্‌টো-পাল্‌টা দু' রকম কথার দুইই কি সত্যি হতে পারে কখনো? কোন্‌টা সত্যি তা হলে?

সহসা ফিরিওয়ালার চীৎকারে কাঞ্চনের সমস্ত চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

'সাবা—ন্ তরল আল্‌তা চাই
মাথার কাঁটা কিলিপ্ চাই
হেজ্‌লিন চাই পমেটম্ চাই—'

কাঞ্চন তাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'দেখি কি আছে তোমার?' লোকটা তার বোঁচ্‌কা খুলে কাঞ্চনকে দেখাতে লাগ্‌ল।

'কি চাই আপনার? সব আছে, সাবান, তরল আলতা, কিলিপ, মাথার কাঁটা, সেফ্‌টিপিন্, মাথার চিরুনী, হেজ্‌লিন, হিমানী, পাউডার—

হ্যাঁ, সমস্তই চাই—আমার মার জন্য।'

'তা, কোন বাড়ী বলুন, আমি যাচ্ছি।'

কাঞ্চন গম্ভীর ভাবে বল্ল, 'আমাদের বাড়ী? সে আমাদের দেশে।'

লোকটা হতাশ হয়ে বল্ল, 'এখানে বাড়ী নয়? কিন্‌বেন না যদি তবে কেন আমাকে কষ্ট দিলেন?'

কাঞ্চন আশ্বাস দিয়ে বল্ল, 'কিনব বই কি! মার জন্য কিনতে হবে—আমাকেই কিন্‌তে হবে, বাবা ত এ সব কিনে দেন্ না কখনো!

বাবা বলেন—এ সব বিলাসিতা। আমি চাই আমার মা একটু বিলাসিতা করুক। বিলাসিতা করলে মাকে ভাল দেখায়।'

লোকটা কাঞ্চনের কথা শুনে হাস্‌ল। বলল, 'তুমি ত ছেলেমানুষ! তুমি কি করে কিন্‌বে?'

'কেন? রোজ্‌গার করে? আমি ত চাকরি করতেই কলকাতায় এসেছি। তা তুমি তো এই রাস্তা দিয়েই রোজ যাও এই সময়ে—কেমন? প্রথম মাসের মাইনে পেলেই এ সব আমি কিন্‌ব। কিনে ডাকে পাঠিয়ে দেব। ডাকে এ জিনিষ যাবে না?'

'খুব যাবে। ডাকে কি না যায়! মাশুল বেশী লাগ্‌বে কেবল।'

'তা লাগুক্‌। মাশুলের জন্য আমি কেয়ার করি না। হঠাৎ এ সব পেলে মা কি রকম আশ্চর্য্য হয়ে যাবে আমি তাই ভাব্‌ছি। সে ভারী মজা হবে।'

লোকটা আবার হাঁকতে হাঁকতে চলে গেল। কাঞ্চন সেই ভারি মজার দৃশ্যটা একবার মানস-চক্ষে নিরীক্ষণ করে নিল। পিয়ন বেটা মস্ত এক পার্শ্বেল নিয়ে হাজির হয়েছে তাদের বাড়ীতে। কিসের পার্শ্বেল? কার নামে?

বাড়ী থেকে পালিয়ে

বাবা ছুটে বেরিয়েছেন। উহুঁ—বাবার নামে নয়, মার নামে। মার নামে এত বড় পার্শ্বেল? বাবার মুখ তখন চূণ। তাদের বাড়ি এত বড় পার্শ্বেল কখনো আসে নি। আর যদিবা অবশেষে একদিন এল, তাও এল কিনা মার নামে! মনে মনে ভারী হিংসে হয়েছে বাবার। যেমন হিংসে, তেম্নি হয়েছে কৌতুহল!

বাবা পিয়নকে তাড়া দিচ্ছেন, 'দাও না আমাকে! আমারই ত বৌ—তারই নামে এসেছে, আমাকে দিতে দোষ কি?' পিয়ন বল্‌ছে, 'উহুঁ, হুকুম নেই। রেজেষ্টরী কিনা, মার সই চাই।'

মা তো অবাক্! যা কখনো আসে না, আসার কল্পনাও তাঁর স্বপ্নে নেই, তাই কিনা এল তাঁর নামে! কি আছে না জানি ওর মধ্যে! কেই বা পাঠিয়েছে কে জানে।

সই দিয়ে পার্শ্বেল নিয়ে খুলে দেখেন—ওমা, এ যে সাবান, তরল

আল্‌তা, মাথার কাঁটা, কিলিপ্‌, সেফ্‌টিপিন, হেজ্‌লিন, পাউডার, পমেটম—আরো কত কি! কেবল বিলাসিতা আর বিলাসিতা!

কে পাঠালে? মা যখন ভাব্‌বেন—কে পাঠালে! আঃ, তখন কি মজাই না হবে!

নাঃ, একটা চাক্‌রির যোগাড় করতে হল তাকে। তা না হ'লে কিছু হচ্ছে না।

ও বাবা, এ আবার কি! এত জল হঠাৎ কোত্থেকে! এ যে দেখি—পাইপে করে রাস্তায় জল দিচ্ছে,—ভারী চমৎকার ত! কিন্তু আর একটু হলেই সে ভিজে গিয়েছিল! যদি ঘুরিয়ে না নিত তা হ'লেই নেয়ে উঠ্‌তে হত আর কি! একটা লোক রাস্তার মুখে পাইপ এঁটে দিচ্ছে, আর একজন কত কায়দায় জল ছড়িয়ে যাচ্ছে। কাঞ্চন জল দেওয়া দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল।

কাঞ্চনের হঠাৎ মনে হল—এ ত বেশ কাজ! এ কাজ করলে হয় না? এ ত কাজ নয়, কাজ-কাজ খেলা।

যদি এ কাজ পায় সে খুব ক'ষে রাস্তায় জল দেয়—দিনরাতই জল দেয়—সহরের সব রাস্তায়। পাইপে করে জল ছিটানোয় নিশ্চয়ই খুব আরাম।

যে লোকটা জল দিচ্ছিল কাঞ্চন তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার তো বেশ কাজ হে! তুমি কি দিনরাতই রাস্তায় জল দাও?'

'দু'বার দিতে হয়, খুব ভোরে আর বিকালে।'

'বাঃ, বেশ ত! তা ক'টাকা পাও এ জন্যে?'

'বেশী না বাবু, মোটে আঠারো টাকা।'

কাঞ্চন অবাক্ হয়ে বললে, 'আ-ঠা-রো টা-কা। সে যে অনেক!'

'অনেক কি বাবু! ওই ক'টা টাকায় আমাদের কি চলে? আমাদের পোষায় না ওতে।'

'তা' এ কাজ কোথায় পাওয়া যায়?'

'মুন্সীপালীতে।'

'সে কোথায়? আমাকে কাল নিয়ে যাবে?'

'খুব, কাল এইখানে দাঁড়িয়ে থেক এমন সময়ে, আমরা জল দিতে আসব, সেইখানে নিয়ে যাব।'

'নিয়ে গেলে হবে না, আমাকেও এই কাজ একটা দিতে হবে। আমিও জল দেব রাস্তায়।'

'কাজ দেবার মালিক কি আমরা, বাবু? কাজ দেন বড় সাহেব।'

'বেশ, তুমি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেয়ো, কেমন?'

'আচ্ছা।'

লোক দু'টো জল দিতে দিতে চল্‌ল, কাঞ্চন আর তাদের সঙ্গে গেল না। সে পরিশ্রান্ত হয়ে রাস্তার একধারে বসে তার আসন্ন এই চমৎকার চাকরীর কথাটা ভাব্‌তে লাগ্‌ল। আঃ, রাস্তায় জল দিতে কী স্ফূর্তি! এই বোধ হয় পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ! আঠারো টাকাও কম টাকা নয়, ওতে বোধ হয় ওই লোকটার বোঁচ্‌কার সমস্ত জিনিষ কেনা যায়!

সেখান থেকে সামান্য দূরে বড় রাস্তার মোড়ে একটা পোড়ো জমিতে অনেক লোক জমেছিল,—জনতার বৃত্তাকার ক্রমশঃই বড় হয়ে উঠ্‌ছিল। কাঞ্চনের দৃষ্টি ও পা সেই দিকে আকৃষ্ট হ'ল। অতি কৌশলে এবং কষ্টে

সে সেই সজ্ঘবদ্ধ লোকগুলোর ভেতর দিয়ে গলে গিয়ে একটা ভাল জায়গা দখল করে বস্‌ল।

বৃত্তাকারের মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে মড়ার খুলি, হাড়-গোড়, এবং আরো হরেক রকম জিনিষ। একজন আলখাল্লা পরা লোক আগড়ম-বাগড়ম মন্ত্র আউড়ে ভেল্‌কি দেখাচ্ছিল। কাঞ্চন ভাল হয়ে জমে বস্‌ল।

যে সে ভেল্‌কি নয়—ভানুমতীর ভোজবাজী! আলখাল্লা পরা লোকটা বক্তৃতা দিচ্ছিল যে পেশাদার ম্যাজিক-ওয়ালাদের সাধ্য নেই যে তার মত খেলা দেখায়। এমন খেলা পৃথিবীতে কেবল একজন জানে এবং সেই একজন হচ্ছে সে নিজে। তার কথায় কাঞ্চনের দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল।

একটা ছোট ছেলেকে বেঁধে-ছেঁদে একটা বড় চুপ্‌ড়ির মধ্যে পুরে ডালাটা বন্ধ করা হ'ল, তার পরে চুপ্‌ড়িটাকে দড়ি দিয়ে ভাল করে বাঁধা হ'ল। ভেল্‌কি-ওয়ালা প্রশ্ন করল, 'ভেতরে আছিস্‌ তো?' ছেলেটা ভেতর থেকে সাড়া দিল। তার পরে ভেল্‌কি-ওয়ালা একটা প্রকাণ্ড ছোরা নিয়ে নির্দ্দয় ভাবে ডালাটার ভেতরে খোচাতে লাগ্‌ল। কাঞ্চনের সমস্ত আত্মা আঁৎকে উঠ্‌ল—ছেলেটা মারা যাবে যে! তার পরে চুপ্‌ড়ি খুলে দেখা গেল ছেলেটা তার মধ্যে নেই, সে জনতার ভেতর থেকেই বেরিয়ে এল কাঞ্চনের পাশ দিয়ে।

কাঞ্চন ত অবাক্‌! এ রকম দৃশ্য সে জীবনে দেখে নি। তখন ভূমিকম্প সুরু হ'লেও সে টের পেত্‌ কি না সন্দেহ।

লোকটা একটা আমের আঁটি পুঁত্‌ল, দেখ্‌তে দেখতে সেটা দাঁড়াল

বাড়ী থেকে পালিয়ে

একটা আমের চারা! দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাতে ফল ধরল—একেবারে একটা আস্ত পাকা আম। ভেল্‌কিওয়ালা আমটা কেটে জনতাকে পরিবেশন করতে গেল, কিন্তু ভেল্‌কির আম খেতে কারু সাহস হ'ল না। কাঞ্চন এক টুক্‌রো খেয়ে দেখ্‌ল—সত্যি একেবারে আসল আম! অবাক্ কাণ্ড!

বারো

তার পরে তাসের ম্যাজিক,—আরো কত কি! দেখ্তে দেখ্তে অনেক রাত হয়ে গেল। এইবার লোকটা সবার কাছে একটা করে পয়সা চাইতে লাগ্ল। অনেকে দিল, অনেকে দিল না। লোকটা কাঞ্চনের কাছে কিছু চাইল না, চাইলে বোধ হয় সে আনিটা দিয়ে দিত!

খেলা ভেঙে গেলে সবাই চলে গেল। ভেল্‌কিওয়ালা তার জিনিষপত্র গুছোতে লাগ্ল—তার ছেলে তাকে সাহায্য করছিল। কাঞ্চন তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে নেবে তোমার দলে? আমি ম্যাজিক শিখ্ব।'

ভেল্‌কিওয়ালা বল্লে, 'বেশ শেখাব তোমাকে। আমার সঙ্গে যাবে?'

কাঞ্চন উৎসাহিত হয়ে বল্লে, 'এখুনি।'

লোকটা বললে, 'তোমাকে এই পোষাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে আমাকে পুলিস পাকড়াবে। তোমার জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি-পিরাণ পরতে হবে—পারবে ত?'

'খুব। দাও না একটা লুঙ্গি, আমি এখুনি পরছি।'

'এখন নয়। এখানে লোকজন তোমাকে পরতে দেখ্বে। কাল সকালে আমার আস্তানায় যেয়ো। এই রাস্তা ধরে সোজা গেলে সিঁদুরিয়াপট্টি,—সেখানে ইউসুফ্ ভেল্‌কিওয়ালার নাম করলেই লোকে দেখিয়ে দেবে। কাল সকালে যেয়ো।'

লোকটা চলে গেল। কাঞ্চন তাকে জানাল কাল ভোরে সে নিশ্চয় যাবে।

সামনের দোকানের ঘড়িতে কাঞ্চন দেখ্‌ল এগারোটা। ওঃ, অনেক রাত হয়ে গেছে। এ পর্য্যন্ত সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ছিল। উদরের মধ্যে একটা তীব্র ক্ষুধার প্রেরণা এতক্ষণ পরে সে অনুভব করল। অবিলম্বেই কিছু খাওয়া তার দরকার।

একটা মিঠাইওয়ালার দোকানে গিয়ে সে বলল, 'ও গুলো কি তোমার? লুচি ত? দাও না চার পয়সার।'

'পুরী নেহি—উ কচৌরি।'

'দাও কচৌরিই দাও। চার পয়সার।'

মিঠাইওয়ালা তাকে একটা ঠোঙ্গায় ক'রে দু'খানা কচুরি আর একটুখানি আলুর তরকারী দিল। তার পর আনিটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুম হিন্দু।'

'হাঁ।'

ঠোঙ্গাটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আনিটা ফেরং দিয়ে বল্‌ল, 'ই আনি নেহি চলে গা। সিসা হায়।'

'বা রে!' কাঞ্চনের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না।

'ঠক্‌লানেকা জায়গা নেহি মিলা?' বলে মিঠাইওয়ালা তাকে অনেক গালমন্দ দিল। একমুহূর্ত্তে চারিধারে অনেক লোক জমে গেল। একে দারুণ ক্ষুধা, তার ওপরে এত লোকের সামনে অপমান—কাঞ্চনের চোখ ফেটে জল আস্‌বার মত হ'ল। সে আর সেখানে দাঁড়ালো না।

খাওয়া না হয় নাই হ'ল, শোয়া তো দরকার। কিন্তু কোথায়

শোবে? এত রাত্রে কার বাড়ী আশ্রয় পাবে? তা ছাড়া খাদ্যই হোক্ আর স্থানই হোক—কিছু ভিক্ষা করতে তার ভারী লজ্জা করে। 'আমাকে কিছু খেতে দেবে? শোবার জায়গা দেবে?' এ কথা মুখ ফুটে বল্‌তে তার মাথা কাটা যায়। সে ভাব্‌লে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেই আজ রাতটা কাটাবে।

কিন্তু ঘোরেই বা আর কতক্ষণ? আজ সকাল থেকে সমস্ত দিনই তো ঘুরছে। তা ছাড়া, ঘুমে তার সমস্ত শরীর যেন ঝিম্‌ঝিম্ করছিল।

কাঞ্চন দেখ্‌ল, দু'ধারের ফুটপাথে বিস্তর লোক শুয়ে আছে। যত দূর সে হাঁট্‌ল দেখ্‌ল কেবল লোক আর লোক। এদের বোধ হয় ঘর বাড়ী নেই—এরা বোধ হয় পথে শুয়েই জীবনটা কাটায়। সেও কেন না ফুটপাতে শোবে?

কাঞ্চন একটা জায়গা বেছে নিয়ে শুয়ে পড়্‌ল। শুয়ে শুয়ে সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, কাল রাত্রে বিয়েবাড়ীতে কি আরামেই না কেটেছে। আর আজ এই ফুটপাথে!

'এ কে এখানে?'

একজন ভদ্রলোক সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, কাঞ্চনকে সেখানে শয়ান দেখে বিস্মিত হয়ে এই প্রশ্ন করলেন।

কাঞ্চন ক্ষীণস্বরে উত্তর দিল, 'আমি।' তার কথোপকথনে বিশেষ উৎসাহ ছিল না।

'তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, এখানে শুয়ে? এস, আমার সঙ্গে এস।'

অগত্যা কাঞ্চন উঠ্‌ল। বল্‌ল, 'কোথায় শোব? আমার শোবার জায়গা নেই।'

বাড়ী থেকে পালিয়ে

'রাস্তায় যত ছোট লোকে শোয়, তাদের সঙ্গে—ছিঃ! তুমি এস আমার সঙ্গে।'

কাঞ্চন ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল। যাক্, তা হলে সত্যিই ভগবান্ আছেন! একটু আগেই ভগবানের ওপর তার যা অভিমান হচ্ছিল। এই ত তিনি আজ রাত্রের মত খাবার ও শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন!

আর কত দূর হাঁট্‌তে হবে? ভদ্রলোকের বাড়ী কত দূর আর? কাঞ্চনের পা চলে না, তবু গরম ভাত আর উষ্ণ বিছানার লোভে কোন রকমে সে হাঁট্‌ছিল। ভদ্রলোক যা তাড়াতাড়ি চলেন! কাঞ্চনকে তাঁর সঙ্গে প্রায় দৌড়োতে হচ্ছিল।

অনেকক্ষণ পরে একটা পার্কের কাছাকাছি এসে ভদ্রলোক থাম্‌লেন। বললেন, 'পার্কের গেট্ যে বন্ধ দেখ্‌ছি। যাক্ গে, তুমি টপ্‌কে যাও।'

'টপ্‌কে! কেন?' কাঞ্চন অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ভদ্রলোক আবার বল্‌লেন, 'ভেতরে যাবে কি করে? গেট্ যে বন্ধ। টপ্‌কে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ওঠ, আমি ধরছি তোমাকে।'

রেলিংএর উপর দিয়ে কাঞ্চনকে পার্কের ভেতরে নামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'ওই যে সব বেঞ্চি দেখ্‌ছ? ওই বেঞ্চে গিয়ে শুয়ে থাকো। কোন ভয় নেই, কেউ কিচ্ছু বল্‌বে না।'

ভদ্রলোক চলে গেলেন। কাঞ্চন অনেকক্ষণ স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পার্কের ভেতরের পুকুরে গিয়ে এক পেট জল খেল। খেয়ে বেঞ্চিতে এসে শুয়ে পড়্‌ল। শুয়ে শুয়ে সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—

কালকের ভোজটা কেমন!

বাড়ী থেকে পালিয়ে

মিনি মেয়েটা বেশ—কিন্তু তার ছোড়দা—
সি, আর, দাশ—সিল্কের চাদর—পকেট কাটা—
মাম্‌লেট—হাওড়া ষ্টেশন—টিঞ্চার আইডিন—
তারপর সে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

তের

'ওহে ওঠো ওঠো, এটা ঘুমোবার জায়গা নয়! আরে, এর ঘুম যে ছাই ভাঙে না, কোথাকার আপদ্!'

কাঞ্চন তখন প্রকাণ্ড ভোজে বসে গেছে। লুচি, পোলাও পায়েস, সন্দেশ—নানাবিধ খাদ্য! পরিবেষণ করছে আবার মিনি! কিন্তু খাবারও যেমন ফুরোয় না, তার খাওয়াও তেমনি শেষ হয় না!

কিন্তু প্রচণ্ড তাড়নায় তাকে চোখ খুল্‌তে হ'ল।

'বাবা! কি ঘুম তোমার! কুম্ভকর্ণকেও হার মানায়!'

কাঞ্চন দেখ্‌ল সকাল হয়ে গেছে, রোদ উঠেছে এবং তার অব্যবহিত সামনে একজন বৃদ্ধ লোক অত্যন্ত অপ্রসন্নমুখে দাঁড়িয়ে বকছেন। চোখ রগ্‌ড়ে উঠে সে বেঞ্চির এক ধারে বস্‌ল।

ভদ্রলোক বকে চল্লেন, 'সকালে কি পড়ে পড়ে ঘুমোয়? ভোরে ধীর হাওয়া বয়, গায়ে লাগালে জোর বাড়ে। আজকালকার ছেলেরা যেন কী? আমার পঁয়ষট্টি বছর বয়স, সেই প্রত্যূষে উঠে বেরিয়েছি, আর এই সব জোয়ান্ ছোক্‌রা কোথায় মাঠে ছুটোছুটি করবে, না—'

কাঞ্চন তাঁর বকুনি থেকে পরিত্রাণ পেতে সেখান থেকে উঠে পুকুরে মুখ ধুতে গেল।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে ঘাটের পইঠা থেকে এক দৌড়ে কাঞ্চন একেবারে ফুটপাথে। কাল যাদের সঙ্গে কাঞ্চন প্যারেড্ করেছিল সেই দলটাই,—কিন্তু এবার তাদের আগে ও পিছনে অনেক কনেষ্টবল।

'বাঃ, আজকে যে দেখ্‌ছি পুলিসরাও ওদের সঙ্গে মার্চ্চ্‌ করছে। ওরাও গান্ধীর দলে ভিড়ে গেল নাকি ?'

'নাহে, না, ওদের ধরে নিয়ে চলেছে থানায়।'

কাঞ্চনের প্রশ্নের জবাব যে দিল সেও ছেলেমানুষ, তার চেয়ে দু'-চার বছরের যদি বড় হয়। কাঞ্চন তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'থানায় নিয়ে চলেছে, তুমি কি করে জান্‌লে ?'

'আমি জিজ্ঞাসা করলুম যে। ওর মধ্যে আমার বন্ধু আছে, ওই যে মাঝখানে, গায়ে লাল খদ্দর, ও। আজ খুব ভোরে কংগ্রেস-আফিসে থানাতল্লাসী হয়ে গেছে, ওদের সবাইকে গ্রেপ্তার করেছে।'

ওদের থানায় নিয়ে গিয়ে কি করবে ?'

'জেলে দেবে।'

'জেলে ? তা হলে তো ভারী বিপদ! আমি শুনেছি জেল ভারী খারাপ জায়গা, ভারী ভয়ের।'

'কেন, আমি তো জেলে ছিলুম, কাল সন্ধ্যায় ছাড়া পেয়েছি।'

কাঞ্চন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল,—এ ছেলেটা বলে কি ? তারা দু'জনে পার্কের মধ্যে এসে নরম ঘাসে এক জায়গায় বস্‌ল। ছেলেটা তার কারাবাসের কাহিনী বলে চল্‌ল, কাঞ্চন হাঁ করে শুন্‌তে লাগ্‌ল। সেই জেলে আগে সব চোর ডাকাত খুনে বদমায়েস থাকৃত, তাদের খালি করে মফঃস্বলের জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে, এখন কেবল কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার—তারাই থাকে। গল্প চলে, কাঞ্চন আর বিস্ময় চেপে রাখতে পারে না, সে বলে উঠ্‌ল, 'বল কি ? একটা গোটা নিমগাছ সবাই মিলে দাঁতন করে ফেল্‌ল ?'

'ফেল্‌বে না? আমরা চার হাজার লোক আছি যে, তার মধ্যে ছেলে ছোক্‌রাই বেশী। সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই সবাই নিমগাছে উঠে বসি,— আমাদের দাঁতন করতে হবে তো?'

'তা বলে একটা গোটা নিমগাছ?'

'চার হাজার লোক দাঁতন করলে একটা নিমগাছ আর ক'দিন টেঁকে?'

'ভারী আশ্চর্য্যি তো!'

কাঞ্চন মনে মনে ভাবে, কিন্তু ভাব প্রকাশের ঠিক কথাটি খুঁজে পায় না। অনেকক্ষণ পরে কথাটা পেয়ে অন্য গল্পের মাঝখানেই বলে উঠে, 'কিন্তু তার শাখাপ্রশাখা, সব সমেত?'

গল্পে বাধা পড়ায় এবার ছেলেটা একটু বিরক্ত হয়। বলে 'বড় বড় শাখা-প্রশাখা কি আর, ছোট ছোট শাখা-প্রশাখা। গুঁড়িটাও বাদ।'

ছেলেটা বলে চলে, 'সমস্ত দিন আমরা হৈ চৈ ফুর্ত্তি করে ঘুরে বেড়াই—অবশ্যি জেলের মধ্যে। বাইরে তো যেতে দেয় না। আর রাত্রে কেবল ঘরে পুরে রাখে। আমরা থাকি এক ধারে, দাশ-মশাই থাকেন আরেক ধারে।'

সি, আর, দাশ! তিনিও জেলে? কাঞ্চনের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ছেলেটা চলে গেলে কাঞ্চন নরম ঘাসের উপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ তার কথাগুলো ভাবতে থাকে।

কিন্তু চিন্তা করা কাঞ্চনের পোষায় না, বিশেষতঃ পেটের মধ্যে ক্ষিদে নিয়ে! কাল রাত্রে যে খাওয়া হয়নি এত বড় কথাটা এমন গল্পের মধ্যিখানে এতক্ষণ কাঞ্চনের মনে পড়ে নি, কিন্তু সেই কথাটাই এখন

তার উদরের মধ্যে একমাত্র কথা হয়ে উঠ্‌ল। আচ্ছা, জেলখানায় খেতে দেয় ত? খেতে দেয় নিশ্চয়, নইলে লোকগুলো কেবল নিমগাছের ছোট খাট শাখা-প্রশাখা চিবিয়েই কিছু আর বাঁচে না!

কিন্তু জেল তো পরের কথা, কি খেয়ে আপাততঃ বাঁচে কাঞ্চন?

কি করে কাঞ্চন—কোথায় যায়? কাল সকালে যে চমৎকার ভদ্রলোকটি সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তার কথা কাঞ্চনের মনে পড়ল। ভদ্রলোক বলেছিলেন—এই আমার কার্ড রাখো, এতে আমার নাম ঠিকানা আছে। কখনো অসুবিধায় পড়লে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।

কাঞ্চন ভেবে দেখল আজকের এই অবস্থাটাকে অসুবিধাই বিবেচনা করতে হবে। খালি পেটে থাকার চেয়ে মারাত্মক অসুবিধা আর কি হতে পারে? এ রকম অসুবিধায় কাঞ্চন এর আগে আর কখনো পড়ে নি। বাড়ীতে এতক্ষণ তার তিন বার খাওয়া হয়ে যেত।

কিন্তু সেই কার্ডখানা? পকেটেই তো ছিল,—কিন্তু কই?, যাঃ, হারিয়ে গেছে! তা হ'লে আর যাবে কি করে? উৎসাহে কাঞ্চন উঠে দাঁড়িয়েছিল, আবার মুহ্যমান হয়ে বসে পড়্‌ল।

পেটের মধ্যে যেন সূচ ফুটছে।

মিনিদের বাড়ী যাবে? সেখানে হয়ত আজ বৌভাত, আজও খুব খাওয়া-দাওয়া। সেখানে গেলেই তো হয়। সেই বেশ। তাদের বাড়ী চিনে যাওয়া বোধ হয় খুব শক্ত হবে না।

মিনিদের বাড়ীর দোর-গোড়ায় সেই এঁটোপাতার জঞ্জাল! ভিখারীরা তার থেকে লুচি, তরকারী, সন্দেশের টুক্‌রো বেছে জড় করছে। সেই স্তূপীকৃত ভুক্তাবশেষ কাঞ্চন মানসচক্ষে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

আর যদি সেখানে আজ বৌভাত না থাকে? না'ই থাক্‌ল কোন ভোজ, সে মিনিকে ডাক্‌বে। ডেকে বল্‌বে তাকে। মিনি তার ছোড়দার মত কি ভোম্বলের মত নয়, সে নিশ্চয় তাকে খুব যত্ন করে খাওয়াবে। মিনি তার চওড়া বুকের প্রশংসা করে। মিনিকে সে পাঞ্জা কষ্‌তে শিখিয়ে দেবে, ছেলেদের জব্দ করার আরো কত রকম প্যাঁচ আছে, সব শিখিয়ে দেবে। হ্যাঁ।

মিনির কাছে গিয়ে যদি তাকে শেখানোর এই প্রস্তাব করে সে নিশ্চয়ই ভারী খুসী হবে। তাকে নিশ্চয়ই বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যাবে, তাদের মার কাছে। তাদের মা না জানি কি রকম! তার মার মত কি? খেতে সে চাইবে না, কিন্তু না চাইলেও মিনি জোর ক'রে তাকে খাওয়াবে। নিশ্চয়।

হ্যাঁ—তাই ত! ঠিক হয়েছে তবে! আজ সকালেই তো সে স্বপ্ন দেখেছে মিনি তাকে খাওয়াচ্ছে। মা বলেন, ভোরের স্বপ্ন ভারী সত্যি হয়।

কাঞ্চন উঠে দাঁড়াল। স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করতে তিলমাত্র বিলম্ব তার সইছিল না। সে পার্ক থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল।

চৌদ্দ

কিন্তু, কোথায়? এ রাস্তা ও রাস্তা কত রাস্তা ঘুরল, মিনির বাড়ীর মত বাড়ীও দু'-চারটা তার চোখে পড়ল, কিন্তু সেগুলো মিনির বাড়ী নয়। কলকাতার পথের মত বিশ্বাসঘাতক পৃথিবীতে বোধ হয় আর দ্বিতীয় নেই! এমন কি, স্বপ্নের প্রতি বিশ্বাস পর্য্যন্ত তার টলে গেল। কলকাতা-জায়গাটা বোধ হয় সৃষ্টিছাড়া, এখানে কারু স্বপ্ন বুঝি ফলে না?

অনেক ঘুরে অবসন্ন হয়ে অবশেষে একটা জলের কলের কাছে দাঁড়িয়ে কাঞ্চন ধুঁক্‌তে লাগ্‌ল। যা তেষ্টা পেয়েছে, এক বাল্‌তি জল এক নিঃশ্বাসে উড়িয়ে দিতে পারে। রোদে ঘুরে জল খাওয়া মার বারণ, মা বলেন, জিরিয়ে খাবি। কে যেন কবে ভয়ঙ্কর গরম থেকে এসে ঠাণ্ডা জল খেয়ে হঠাৎ সর্দ্দি-গর্ম্মি হয়ে মরেছিল, তাই থেকে মার ভারী ভয়। পাছে কাঞ্চন কোনদিন তাঁর এই নিষেধ অমান্য করে এইজন্য তিনি তাকে গা-ছুঁইয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়েছেন। কাজেই, কলের সন্নিকটে রোদে দাঁড়িয়েই কাঞ্চন বিশ্রাম করতে লাগ্‌ল। দিব্যি না মান্‌লে মা মরে যায় যদি।

কিছুক্ষণ পরে যখন কাঞ্চনের মনে হ'ল যথেষ্ট জিরোনো হয়েছে, এইবার জল খাওয়া যেতে পারে তখন কল টিপ্‌তে গিয়ে দেখে, এ কি, কল থেকে যে জল পড়েই না। আরো জোরে, আরো প্রাণপণ করে টেপে—না, এক ফোঁটাও না। এ কি হ'ল? একজন লোককে ডেকে বলে, 'ভাই, কলটা একটু টেপো না।'

সে উত্তর দিল, 'টিপে কি হবে? আর কি জল পড়বে? এগারোটা বেজে গেছে যে। জল আস্‌বে আবার সেই তিনটেয়।'

য়্যাঁ? জলও খেতে পাবে—সেই তিনটেয়?

সেই পার্কের ভেতরে একটা পুকুর আছে বটে, কিন্তু রাস্তা চিনে কি সেই পার্কে পৌছুতে পারবে? কলকাতার পথকে তার আর বিশ্বাস হয় না। কঞ্চনের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে।

দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই, হাঁটতেই হবে। সেই পুকুর—তার আগে ও তিনটার আগে কোথাও জল নেই।

কিছু দূর গিয়ে দেখে—আঃ, এই ত জল রয়েছে। রাস্তার ধারে লোহার চৌবাচ্চায় চমৎকার জল। জল খেতে যাবে, এমন সময়ে একজন পাহারাওয়ালা এসে তাকে বাধা দিলে। মানুষের জন্য এ জল নয়, ভাড়াটে গাড়ীর ঘোড়ার জন্য।

লোকটা বলে কি? ঘোড়ার জন্য জল আছে, মানুষের জন্য জল নেই?

কাঞ্চন আর দাঁড়াতে পারে না, মাটিতে বসে পড়ে।

সাম্‌নে একটা ছোটখাট মুদীর দোকান, দোকানদার কাঞ্চনকে ডাক্‌ল—'খোকা, এখানে এসে জল খেয়ে যাও।—খুব তেষ্টা পেয়েছে, না? না, না, ঘটি নয়, তোমরা কি? কায়স্থ? তা হোক্, তোমার হাত ভারী নোংরা। বল্‌ছ আল্‌গোছে খাবে? তা কেন, তুমি হাত পাতো, আমি ঢেলে দিচ্ছি।'

যে নোংরা হাত ঘটিতে দেবার পক্ষে অনুপযুক্ত সেই নোংরা হাতে আকণ্ঠ জল খেয়ে কাঞ্চন অনেকখানি সুস্থ হ'ল; তার মুখ থেকে কথা বেরুল।

মনে করল না, তার কৌতূহলের কোন জবাব না দিয়ে সে নাকের সোজা চলতে সুরু করে দিল।

পার্কে গিয়ে একটা ছাতওয়ালা পরিষ্কার বেঞ্চি দেখে শুয়ে পড়ল সে।

যখন তার ঘুম ভাঙ্‌ল তখন ভারী সোরগোল। সমস্ত পার্ক লাল পাগ্‌ড়িতে ভর্ত্তি। কি ব্যাপার? মিটিং হচ্ছে নাকি? একধার

থেকে সব গেরেপ্তার করছে বুঝি? কাঞ্চন তটস্থ হয়ে উঠে বসল। প্রথমেই তার মনে হ'ল পালাবার কথা। কিন্তু পালাতে হ'ল না, পার্কের ভেতর যে লোকজন ছিল পাহারাওয়ালারা তাদের বার করে দিচ্ছিল। কাঞ্চনকেও বেরিয়ে যেতে হ'ল।

পার্কের চার পাশের রাস্তায় বেজায় লোকের ভীড়। চার ধারেই

লোক জমে গেছে; তাদের কারু বিস্ময়, কারু উন্মাদনা, কারু শুধুই কৌতূহল।

একটু পরেই ঘটনাস্থলে ঘোড়ার পিঠে চেপে সার্জেন্টরা এসে পড়ল। এসেই তারা লোক হটাতে আরম্ভ করে দিল। ঘোড়াদের এবং সোয়ারদের দেখেই জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য জেগেছিল, সেই চাঞ্চল্য ক্রমে আন্দোলনে পরিণত হ'ল এবং সেই আন্দোলন অকস্মাৎ বেগবান্ হয়ে উঠ্ল। অর্থাৎ, সোজা কথায় জনতা প্রস্থানোদ্যত হল।

বাবা বলেন, 'শত হস্তেন বাজিনঃ'। চাণক্যঋষি নাকি বলে গেছেন ঘোড়ার থেকে এক শ' হাত দূরে থেকো। চাণক্যঋষি বোধ হয় এই সব ঘোড়াদের মানসচক্ষে দেখেই এই ভবিষ্যদ্বাণী করে থাক্‌বেন—তা না হ'লে ঘোড়ার থেকে একশ হাত কেন এক হাত দূরে থাকাও কাঞ্চন কোনদিন প্রয়োজন মনে করেনি; এমন কি ঘোড়া দেখ্‌লে তার পিঠের ওপরে থাকাই সে বাঞ্ছনীয় মনে করেছে। কিন্তু তাদের দেশের ঘোড়া আর এই সব হাতীর মত উঁচু ঘোড়া—এ ত ঘোড়া নয়, ঘোটক!

মা অবশ্য শ্লোকটার অন্য রকম ব্যাখ্যা করতেন, বল্‌তেন, যেখানে বাজি পোড়ানো হবে সেখান থেকে এক শ' হাত দূরে থাক্‌বি। কাঞ্চন চিরদিনই ঘোড়ার সম্মুখে মার ব্যাখ্যাটা আর বাজির সম্মুখে বাবার ব্যাখ্যাটা বেশী পছন্দ করেছে, কিন্তু আজকের এই সঙ্কটমুহূর্ত্তে সে বাবার ব্যাখ্যাকেই যুক্তিসঙ্গত মনে করল।

কিন্তু পালাবেই বা কোথায়? এক শ' হাত ফাঁকা জায়গাই কি আছে? গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি। কাঞ্চন হতাশ চোখে চারিদিকে

চেয়ে দেখল, মহর্ষি চাণক্যকে অনুসরণ করবার কোন উপায়ই নেই।

কিন্তু ঘোড়ারা এদিক্ পানে এসে পড়তেই অকস্মাৎ সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, সেই জমাট জনতা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ছুটতে লাগল। কাঞ্চন দেখল আর সবার বাবাও ছেলেদের চাণক্যঋষির উপদেশ দিয়ে রেখেছে, অতএব ভরসা আছে। কাঞ্চনকে কষ্ট করে পাও চালাতে হ'ল না, আগের এবং পেছনের চাপে মাটিতে পা না ঠেকিয়েও সে অনেকটা পেরিয়ে এল। আকাশে হাঁটার অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম। যখন মাটিতে পা ঠেক্‌ল তখন সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে ঘোড়ারা ফিরে গেছে এবং জনতা ছত্রভঙ্গ।

এত দিনে বাবার একটা কথার মানে বুঝল কাঞ্চন। পূজোর সময় হলেই বাবা পাঁজি দেখ্‌তেন আর মাথা নাড়তেন, 'দেবীর এবার ঘোড়ায় আগমন! ফল—ছত্রভঙ্গ! ছত্রভঙ্গস্তুরঙ্গমে!' তখন কাঞ্চন ভাব্‌ত, এবার পূজোয় তাকে নতুন ছাতা না দেবার মতলব। তাই এত ছাতা-ভাঙার অজুহাত! দেবী ঘোড়ায় এলে তার ছাতা ভাঙে কি করে এটা কাঞ্চন কিছুতেই বুঝতে পারে নি—কিন্তু এখন সে দেখ্‌ল যে ঘোড়ার হাতে পড়লে ছাতা কেন মাথা ভাঙাও সম্ভব। আর ঘোড়ার হাতও যা পাও তাই—দু'টোর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, কাঞ্চনের মতে।

কিন্তু যাই হোক, পালানোটা লজ্জার, আস্তে আস্তে কথাটা কাঞ্চনের মনে হ'ল। এক্‌লা থাকলে সে হয়ত পালাতো না, ঘোড়াদের পাশ কাটাতো—বিশেষতঃ হস্ত দস্ত হয়ে এত দূর পালিয়ে আসাটা! ঘোড়ারাও

তাদের ব্যবহার দেখেই বোধ হয় লজ্জিত হয়ে ফিরে গেছে। কিন্তু সে কি করবে, তার ইচ্ছা না থাক্‌লেও না পালিয়ে উপায় ছিল না। যাক্ গে, সে আবার সেই পার্কের ধারে ফিরে গিয়ে দেখ্‌বে কি হচ্ছে সেখানে ; এবার ঘোড়া কেন হাতী দেখ্‌লেও দৌড়াবে না, বড় জোর পাশ কাটাতে পারে।

সে ফিরতে উদ্যত এমন সময়ে সেই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা, যার ডিস্‌পেন্‌সারিতে ব'সে আগের দিন খবরের কাগজ পড়ছিল। তিনি মোটরকারে বসে ছিলেন, লোকজনের ছুটোছুটিতে তাঁর মোটর দাঁড়িয়ে গেছ্‌ল। তিনি কাঞ্চনকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন 'কি হে ছোক্‌রা, খবর কি, তোমাদের স্বরাজ কদ্দূর ?'

কাঞ্চন গম্ভীর হয়ে গেল, কোন উত্তর দিল না।

'পালাচ্ছিলে যে ? তুমি না বল্‌ছিলে দেশের জন্য সর্ব্বস্ব দিতে পারো ?'

এবার কাঞ্চনকে জবাব দিতে হ'ল। সে বিরক্ত হয়ে বল্ল—'দেশের জন্য পারি, কিন্তু ঘোড়ার জন্য নয়।'

ভদ্রলোক হেসে বল্লেন 'বটে ? তা এসো আমার মোটরে। তোমাকে এই গোলমাল থেকে বের ক'রে নিয়ে যাচ্ছি।'

'চাই না যেতে। ঘোড়াকে আমি ভয় করি নাকি ? অনেক ঘোড়ার পিঠে চড়েছি।'

বলে কাঞ্চন আর একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করে পার্কের দিকে পা চালাতে সুরু করল।

পার্কের কাছে এসে দেখে আবার চারিধারে ভীড় জমে গেছে।

দৌড়াদৌড়ির পরিশ্রমে ঘোড়াদের জিব বেরিয়ে গেছে, তারা নিরুৎসাহ হয়ে হাঁপাচ্ছে। কাঞ্চন বিস্ময় প্রকাশ করে বল্ল, 'এই মাত্র এত লোক তাড়াল, আবার লোক জমে গেছে ?'

সোনার চশ্‌মাপরা একজন বল্ল—'কলকাতা সহর, এখানে লোক কি কম ? একজন পিছ্‌লে পড়লে দু'শ লোক দাঁড়িয়ে যায়, মোটর চাপা পড়লে দু' হাজার! এখানে ভিড় তাড়িয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা কি সোজা কথা ?'

কাঞ্চন জবাব দিল—

এই লোক কেহ নাহি যেতে পারে তেড়ে।
যতই করিবে তাড়া তত যাবে বেড়ে ॥

পনর

কাঞ্চন তখনো সেই অতিকায় অশ্বগুলোর দিকে তাকিয়ে। ঘোড়াগুলোকে তার আন্তরিক পছন্দ হয়েছিল। এদের পিঠে চড়তে না জানি কি আরাম! দেশের বেঁটে বেঁটে ট্টু বিস্তর চাপা গেছে, একটু ঢ্যাঙা লোকের পক্ষে সে-ঘোড়ায় চেপে যাওয়ার মানে পায়ে হেঁটে যাওয়া। দস্তুরমত মাটিতে পা ঠেকে! কিন্তু এই ঘোড়ায় যদি চাপা যায়, যতই ঢ্যাঙা হোক্ না কেন, মাটিতে পা ঠেকার তার ভয় নেই। বরং ভয় এই, লোকের মাথায় না ঠেকে যায়।

আচ্ছা, সার্জ্জেণ্ট্‌দের চাকরি কি পাওয়া যায় না? বেশ কাজ ওদের। বেশ আরামের কাজ। সব চেয়ে ভাল কাজ। সে বিবেচনা করে দেখ্‌ল, রাস্তায় জল ছিটানোর কাজও ভাল বটে, কিন্তু সার্জ্জেণ্টের চাকরি পেলে সে কাজ ছেড়ে দিতে এখুনি সে প্রস্তুত। অবশ্য

সার্জেণ্টদের বেতন কত তার জানা নেই, যারা জল দেয় তারা পায় মাসে আ-ঠা-রো টা-কা! সে অনেক টাকা, সার্জেণ্ট্‌রা কত পায় কে জানে! বেশীও হতে পারে, কমও হতে পারে—বোধ হয় ঘোড়াটাই ওদের বেতন! কিন্তু ভেবে দেখ্‌লে ঘোড়ায় চাপ্‌তে পাওয়াটাই কি কম হ'ল? কাঞ্চন বিনা বেতনেই সার্জেণ্ট্‌ হতে রাজী।

ঘোড়ারা লোলুপ নেত্রে জনতার দিকে কটাক্ষ করছিল। তারা জিরিয়ে নিচ্ছে কিংবা আবার তাড়া করবার মতলবে আছে কাঞ্চন ঠিক বুঝতে পারছিল না। যদি আবার তাড়া করে তা হ'লে সে ভারী রেগে যাবে। একটু আগেই তাদের তাড়নায় পা না চালিয়ে বেগে চলার অভিজ্ঞতা সে লাভ করেছিল, কিন্তু সেই ইতিহাস পুনরাবৃত্তির অভিলাষ তার আদৌ ছিল না। আকাশ-পথে বেশী চলাচল ভাল নয়, নিরাপদও নয়—বিশেষ করে স্থল-চরের পক্ষে। তাতে ক'রে চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে যাবার ভয় আছে। ওখান থেকে সরে পড়াটাই কাঞ্চন সমীচীন মনে করল।

কিন্তু কোথায়ই বা যাবে? ভিড় ছাড়িয়ে কিছু দূর গিয়ে দেখে একজন ফেরিওয়ালা আলু-কাব্‌লি হেঁকে চলেছে। কলকাতায় পা দিয়ে অবধি এই অপূর্ব্ব খাদ্যটি বহুবার তার চোখে পড়েছে, দেখা মাত্র তাকে খাদ্য বলে সনাক্ত করতে তার বিলম্ব হয় নি এবং

তার অপূর্ব্বতা সম্বন্ধেও তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ট্যাকে পয়সা না থাকায় জিনিসটা কেবল চোখে দেখাই হয়েছে, চেখে দেখা হয় নি।

সে মনে মনে প্রশ্ন করল, সকালে যখন অচল আনিটার বদলে দু'পয়সার ছাতু সে কিন্‌ল তখন এই ফেরিওলা ব্যাটা ছিল কোথায়? কাছাকাছি থাকে নি কেন? তা হ'লে ত সে ছাতু না কিনে আলু-কাব্‌লিই কিন্‌ত—আনিটার বদলে দু'পয়সার না দিক এক পয়সার দিতে কি খুব আপত্তি হ'ত ওর?

এই সব দার্শনিক প্রশ্ন-জিজ্ঞাসায় সে যখন ব্যতিব্যস্ত সেই সময়ে সকাল বেলার আলাপী সেই ছেলেটির সঙ্গে তার দেখা হ'ল। ছেলেটা হন্ হন্ ক'রে চলেছে, কাঞ্চন তাকে ডাক দিল, 'এমন ছুটে চলেছ কোথায়?'

—'মিটিংএ যাচ্ছি। কেন মিটিং হচ্ছে না?'

—'যেয়ো না, যেয়ো না, সেখানে ভারী ঘোড়ার উপদ্রব!'

—'তাই বুঝি পালিয়ে এসেছ তুমি?'

—'পালিয়ে আস্‌ব কেন? আলু-কাব্‌লি কিন্‌তে এলাম আমি।'

ছেলেটি তাকে ধিক্কার দিল, 'দেশের চেয়ে আলু-কাব্‌লিই তোমার কাছে বড় হ'ল!'

কাঞ্চন অপ্রতিভ হবার ছেলে নয়, 'বাঃ, তোমরা যদি একটা আস্ত নিমগাছ তার সব ছোট-খাট শাখা-প্রশাখা সমেত খেয়ে শেষ করতে পার, আমার বেলা আলু-কাব্‌লি খেলেই দোষ? নিমের চেয়ে আলু-কাব্‌লিটা কি খারাপ হ'ল?'

কাঞ্চনের যুক্তির বহরে ছেলেটা ধাক্কা খেল। সে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বল্ল, 'নিমগাছের চেয়ে ভাল হতে পারে স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলে কি দেশের চেয়েও?'

—'বারে! দেশ সেখানে কোথায়? কেবল মানুষ আর ঘোড়া, ঘোড়া আর মানুষ! দেশ-টেশ সেখানে দেখতে পেলুম না তো!'

ছেলেটি সবিস্ময়ে বল্‌ল, 'বল কি!'

—'তাও আবার মানুষগুলো ঘোড়ার ঠেলায় ছুটোছুটি করে মরছিল, কোথায় পালাবে পথ পাচ্ছিল না। তাই ত আমি বিরক্ত হয়ে চলে এলাম। তাকে যদি তুমি মিটিং বল ত বল্‌তে পার, কিন্তু আমার মতে সেটা মিটিং নয়, রানিং—!—মানুষ আর ঘোড়ার রানিং!'

ছেলেটি বিরক্তি প্রকাশ করল, 'ওগুলো মানুষ নয়, সব গাধা।'

কাঞ্চন ভারী বিস্মিত হ'ল, ছেলেটা বলে কি, রীতিমত জলজ্যান্ত মানুষ—সেগুলো সব গাধা হয়ে গেল? গাধা তো তার মধ্যে একটাও তার চোখে পড়ে নি! অনর্থক দ্বিপদ প্রাণীদের চতুষ্পদে প্রোমোশন দেওয়া সে সঙ্গত মনে করল না, কিন্তু কথা আর না বাড়িয়ে ছেলেটির মতেই সায় দিল, 'তা হবে তুমি যখন বল্‌ছ।'

—'তা হবে কি, নিশ্চয় তাই। গাধা থাকতে দেশের কি আশা বল?'

—'তা বটে, কিন্তু ঘোড়া থাকতেও দেশের কোন আশা নেই। তা মিটিংএ তুমি কেন যাচ্ছিলে?'

—'বক্তৃতা দিতে।'

—'আরে দূর দূর, বক্তৃতা আবার মানুষে দেয়!'

—'কেন? মানুষে দেয় না ত গরুতে দেয় নাকি বক্তৃতা?'

—'বক্তৃতা দিতে হলে দম আট্‌কে আসে, কথা খুঁজে পাওয়া যায় না। কাপড়-জামা ঘামে ভিজে যায়। আমাদের ইস্কুলের মিটিংএ আমি একবার বক্তৃতা দিয়েছিলাম, জীবনে আর কখনো দেব না। বাবা, কি নাকাল!'

—'আমার কিন্তু ভালো লাগে বেশ।'

—'ভারী খারাপ কাজ বক্তৃতা দেওয়া। ওর চেয়ে Essay লেখা ভাল। অন্য বই থেকে টোকা যায়, কিন্তু বক্তৃতার বেলা কি মুস্কিল দেখ, তোমাকে হরদম্ বলে যেতেই হবে, অথচ টোকবার কোন উপায় নেই। তার চেয়ে বক্তৃতার শেষে কসে হাততালি দিতে ভারী মজা! আজকাল আমি বক্তৃতা দিই না, হাততালি দিই।'

ছেলেটি গম্ভীর ভাবে বল্‌ল, 'আমি খুব ভাল বক্তৃতা দিতে পারি। তোমার মত অমন হাঁপিয়ে উঠি না। অনেক বক্তৃতা দিয়েছি আমি।'

কাঞ্চন ওকে উৎসাহ দিল, 'বেশ, তা হ'লে এখানেই দিয়ে ফেল না কেন একখানা। আমি খুব জোর হাততালি দেব।'

—'একজন হাততালি দিলে কি হবে? আর শোনার লোক কই?'

'আরম্ভ করলেই সব এসে জুটবে। কিন্তু ওই আলু-কাব্‌লিওয়ালাকে শোনানো চাই, তোমার বক্তৃতায় দেশের প্রশংসা ত করবেই সেই সঙ্গে ওর আলু-কাব্‌লির একটু প্রশংসা ক'রে দিয়ো।—ও যদি খুসী হয়ে এক পয়সার আলু-কাব্‌লি আমাদের দিয়ে দেয়!'

ছেলেটিরও এই আইডিয়াটা নেহাৎ মন্দ লাগল না। সে উৎসাহিত

হয়ে বল্‌ল, 'বেশ হয় তা হ'লে! হাততালি আর আলু-কাব্‌লি—হু'টো লাভ। বেশ আমি রাজী—'

তার কথা শেষ হতে না হতে' কাঞ্চন এক ছুটে পাশের সরু গলি দিয়ে কোথায় যে ভোঁ দৌড় দিল দেখা গেল না। ছেলেটি বিমূঢ় হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দূরে এক অশ্বারোহী সার্জ্জেন্টের আবির্ভাব লক্ষ্য করল। অশ্বভীত কাপুরুষ কাঞ্চনের ওপর তার অত্যন্ত ঘৃণা হ'ল। ছিঃ, ভারী ভীতু ত ছেলেটা।

কাঞ্চন ফিরতেই সে জিজ্ঞাসা করল, 'পালালে যে হঠাৎ?'

—'বাবার মত একজন লোক ওই ফুটপাথ দিয়ে আসছিল যেন দেখলুম, পরে দেখলুম বাবা নয়, তাই আবার চলে এলুম।'

—'বাবাকে বুঝি তোমার বড্ড ভয়? আমি ভেবেছিলুম তুমি ঘোড়ার ভয়ে পালালে।'

—'হুঁ! ঘোড়াকে আমি ভয় করি নাকি? দিক না আমায় ছেড়ে, আমি চেপে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

ছেলেটি বড় বড় চোখ করে জিজ্ঞাসা করল, 'ঘোড়ায় তুমি চাপতে জান? চেপেছ কখনো?'

—'আক্‌-ছার।'

—'কিন্তু যদি পিঠে নিয়ে ছুট্‌ মারে?'

—'ছুটলেই ত মজা! কিন্তু ছোটে কই? যে-সব বেঁটে বেঁটে ঘোড়া আমাদের দেশের,—দশ ঘা মারলে তবে এক পা নড়ে।'

—'ওঃ, বেঁটে বেঁটে ঘোড়া! তাই বল। এ ঘোড়ায় আর তোমায় চড়তে হয় না—কী উঁচু দেখেছ!'

—'উঁচু হ'ল ত কী! হাতীতে যেমন করে ওঠে তেম্‌নি করে উঠব।'

—'কেমন করে?' ছেলেটির বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়েই চলে। এই পাড়াগাঁর ছেলেটি কলকাতার ছেলের কাছে নতুন মহিমা নিয়ে দেখা দেয়। ঘোড়াতে ত ও চেপেইছে, হাতীতে চাপ্‌তেও ওর বাকী নেই। হাতীতে ওঠা দূরে থাক্‌, চিড়িয়াখানায় অমন যে জনপ্রিয় মানুষ-বৎসল হাতী তার কাছে যেতেও তার ভয় করে। যদি দৈবাৎ ভুলে মাড়িয়ে দেয় তা হ'লেই ত সদ্য ছাতুত্ব-প্রাপ্তি!

কাঞ্চন অবলীলায় উত্তর দেয়, 'কেন, লেজ ধরে উঠ্‌ব।' সেই সঙ্গে ছেলেটির দিকে কৃপার চক্ষে তাকায়! ছেলেটি এবার মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করে, 'কিন্তু তুমি সাইকেল্‌ চালাতে জান না তো! ঘোড়ায় চাপা তো সোজা, সাইকেলে ব্যালান্স্‌ রাখ্‌তে হয়।'

—'ঢের ঢের সাইকেল চালিয়েছি।' সাইকেল চালানো যে একটা বাহাদুরি কাঞ্চন সে কথা আমলই দিতে চায় না।

'কখনো মটর চেপেছ?'

ছেলেটি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কাঞ্চনের জবাবের প্রতীক্ষা করে। এরই উত্তরের ওপর যেন তার আত্মসম্মান নির্ভর করছে। কাঞ্চন এবার দমে যায়, মটরের ওপর ওর ভীষণ লোভ কিন্তু এখনো চাপবার সুযোগ হয় নি ওর। সেই ডাক্তার হতভাগা বলছিল বটে তাকে চাপতে, ইচ্ছাও হয়েছিল তার, কিন্তু অমন বিশ্রী লোকের সঙ্গে মটরে যেতে কেন, স্বর্গে যেতেও তার রুচি নেই—অনেক কষ্টে সে তখন আত্মসম্বরণ করেছে। কিন্তু চাপলেই যেন ভাল ছিল, এখন ত সে অনায়াসেই 'হাঁ' ব'লে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাবু করে দিতে পারত। মিথ্যে ক'রে হাঁ

বল্‌তে তার নিজের কাছে মাথা কাটা যায়—সে কথা সে কিছুতেই বল্‌বে না।

ছেলেটির প্রশ্নকে যেন সে গ্রাহ্যই করে না এমনি ভাবে জবাব দেয়, 'মটর আমরা খাই। পাবা মাত্রই খেয়ে ফেলি।'

যথার্থ উত্তর না পেয়ে ছেলেটি মনে মনে চটে যায়। এ রকম বদ্‌ বাক্যবাগীশদের সঙ্গে কথায় কে পারবে? বিরক্ত হয়ে সে অদূরে পাশের বাড়ীর রোয়াকে গিয়ে বসে পড়ে।

ষোল

কাঞ্চন আলু-কাবলিওয়ালার কাছে যায়, 'তোমার এ সব তো বহুৎ রোজের বাসি? নইলে কিন্‌তাম দু' আনার।'

শূন্য পকেটে হাত ভরে দেয় কাঞ্চন। আলু-কাবলিওয়ালা জবাব দেয়, 'পহলে থাকে তব দাম দিজিয়ে।' দু' আনার আলু-কাবলি এ পর্য্যন্ত কোন ছেলে কেনেনি তার কাছে—উৎসাহ এবং সন্দেহের চোখে সে কাঞ্চনকে লক্ষ্য করে। কিন্তু পকেটস্থ হাতকে সে অবজ্ঞা করতে পারে না।

কাঞ্চন বলে, 'আরে কিন্‌লে ত দাম দেব নিশ্চয়। পহেলা থোড়া চাখনে তো দাও, দু' আনার কিনে গা।'

আলু-কাবলিওয়ালা কিছুটা শাল-পাতায় ক'রে কাঞ্চনকে দেয়। কাঞ্চন ঠোঙাটা হাতে নিয়ে রোয়াকে ছেলেটির পাশে গিয়ে বসে। কোন কথা বলে না, শাল-পাতাসমেত সমান অর্দ্ধেক ভাগ ক'রে ছেলেটির হাতে দেয়। ছেলেটি একবার তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায়, কিন্তু কিছুমাত্র আপত্তি না ক'রেই আলু-কাবলির অংশ গ্রহণ করে। নীরবে দু'জনের মুখ চল্‌তে থাকে।

শাল-পাতাটাকে জিভ দিয়ে সুচারুরূপে মার্জ্জিত ক'রে কাঞ্চন ফেলে দিল, বোধ হয় খুব দুঃখের সঙ্গেই। সত্যিই, ভারী চমৎকার খাবার, চেহারা দেখে যেমন সে কল্পনা করেছিল ঠিক তাই।

কাঞ্চন বুঝতে পেরেছিল যে ছেলেটি তার উপরে রেগেছে; এবং

তার ধারণায় খাবারই হচ্ছে রাগ ভাঙানোর শ্রেষ্ঠ উপায়। যে রাগ কথায় পড়তে চায় না, খাদ্যের মধ্যস্থতায় তা সহজেই অনুরাগে পরিণত হয়। কাঞ্চন তার একটা কারণও আবিষ্কার করেছিল, তা হচ্ছে এই—খাদ্যের দ্বারা দু'জনের মধ্যে একটা উদরের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। আবার হৃদয় জিনিষটা উদরের খুব কাছাকাছি আছে কি না, তাই হৃদয়ের সম্বন্ধ হ'তেও বেশী দেরী হয় না।

কাঞ্চন মনে মনে পর্য্যালোচনা করতে লাগ্‌ল—নাঃ, উদরকে ঠিক হৃদয় বলা যায় না, সে কথা সত্যি। মেষ-শাবক বাঘের উদরে স্থান পায়, কিন্তু হৃদয়ে স্থান পায় কি? নাঃ, উদর আর হৃদয় এক জিনিষ নয় তবে

উদরকে হৃদয়ের দরজা বলা যেতে পারে। আলু-কাবলির দ্বারা ছেলেটির হৃদয়দ্বারে করাঘাত করতে পেরেছে বলে তার মনে হ'ল। তাই এতক্ষণ বাদে অত্যন্ত সন্তর্পণে সে কথা কইল, 'তোমার নামটি কি ভাই?'

'কনক'।

'কনক? কনক ভারী চমৎকার নাম। বল কি, তোমার নাম কনক? এ রকম নাম তো এর আগে আমি শুনি নি! এমন সুন্দর তোমার নাম!'

কাঞ্চনের উচ্ছ্বাস দেখে ছেলেটি বিস্মিত হ'ল। নিজ নামের গুণগানে কে না খুসী হয়? কাঞ্চনকে তার আবার ভাল লাগল; মটরে না চাপুক, নামের মর্য্যাদা সে বোঝে।

কাঞ্চন বল্‌ল, 'এ রকম চমৎকার নাম পৃথিবীতে আর একটিও নেই, কিংবা আর একটিই আছে কেবল।'

'কার নাম?' কনক জিজ্ঞাসা করল। তার নামের মত চমৎকার নাম আর একটা আছে সেজন্য সেই অপরিচিত নামধারীর ওপর মনে মনে তার ঈর্ষা হ'ল।

কাঞ্চন ব'লে চল্‌ল, 'কনক? গোল্ড মানে কনক, কোল্ড মানে ঠাণ্ডা, ওল্ড মানে পুরাতন, আর সোল্ড মানে বিক্রয় করিয়াছিল।'

ছেলেটার মাথায় ছিট্ আছে নাকি! কনক ভাবে। 'কিন্তু আর একটা নাম আমার মত আছে তুমি বল্‌লে যে?' কনক আবার জিজ্ঞাসা করে।

'হ্যাঁ। সে নামটাও খুব চমৎকার।'

কার নাম?'

কাঞ্চন বুক ফুলিয়ে জবাব দেয়, 'কেন, আমার! আমার নাম কাঞ্চন। কনকও যা কাঞ্চনও তাই—একই মানে।'

'তোমার নাম বুঝি কাঞ্চন? জান্‌তাম না ত।' কনক একটু ভাবতে থাকে তারপর বলে, 'যখন এক নাম তখন আমাদের মধ্যে খুব ভাব হবে, না?'

'কাঞ্চন বল্‌ল., চল একটু বেড়াই এধারে-ওধারে। বেড়াতে আমার খুব ভাল লাগে।'

কনক বল্‌ল, 'আমাদের বাড়ী ত কাছেই, চল না কেন, মা খুব খাওয়াবেন। বাবার সঙ্গেও তোমার আলাপ করিয়ে দেব।'

খাওয়ার কথায় কাঞ্চনের উৎসাহ হ'লেও বাবার কথায় সে দমে গেল, বল্‌ল, 'বাবাদের সঙ্গে আমি অলোপ করি না।'

'কেন বাবারা কি খারাপ লোক।'

নিরাসক্ত ভাবে কাঞ্চন জবাব দিল, 'সচরাচর।'

বাবাদের ওপর কনকের স্বাভাবিক পক্ষপাত ছিল, কেননা পয়সা-কড়ি বাগাতে হ'লে বাবার মত বস্তু পৃথিবীতে নেই। এই ত' সেদিনই, তাদের বয়েজ ক্লাব থেকে যা চাঁদা উঠেছিল তাতে আর ক্রিকেট্-সেট্ কেনা হ'ত না—কিন্তু কনক তার বাবাকে গিয়ে ধরতেই কার্ এণ্ড মহলানবিশ থেকে অমন ভাল ক্রিকেট্-সেট্ চলে এল আর চেক্‌টা বাবাই কেটে দিলেন। কাঞ্চনের কথার প্রতিবাদ করল কনক, 'বাবাদের কিছু তুমি জান না।'

অভিজ্ঞ ব্যক্তি-সুলভ ঔদাস্ত-ভরে কাঞ্চন বল্‌ল, 'হাড়ে হাড়ে জানি বাবা।'

'আমার বাবার তুমি কিছু জান না। আমার বাবা তেমন নন্।'

'তোমার বাবা তোমাকে ক'দিন অন্তর ঠেঙান?'

'কেন, ঠেঙাবেন কেন ?'

তা না হ'লে ছেলে মানুষ হয় কখনো ? চাণক্য বলে গেছে কিনা 'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি'—কি সব সংস্কৃত শ্লোক আমার মনে থাকে না ; বাবা আওড়ান। মানে তার মোদ্দা এই, পাঁচ বছরের পর থেকেই ছেলে পিট্‌তে সুরু করবে ষোল বছর পর্য্যন্ত, তবেই সে ছেলে মানুষ হবে।'

কনক সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, 'তা না হ'লে আর মানুষ হবে না ?'

কাঞ্চন মাথা নেড়ে বলে, 'কি করে হবে ? পিটেই ত সব কিছু হয়—লোহা পিটে হাতুড়ি হয়, সোনা পিটে গহনা হয়, তেমনি ছেলে পিট্‌লেই মানুষ হয়। মানে এটা হচ্ছে গিয়ে বাবার মত, আমি কিন্তু এ কথা বলি না। আমার ছেলের গায়ে আমি মোটেই হাত দেব না, তুমি দেখে নিও।'

'তোমার বাবা তা হ'লে তোমাকে মারেন ?'

'তা কি মারতে দিই ? ছেলেবেলায় যা মেরে-ধরে নিয়েছেন। তবে এখনো কয়েক বছর সাবধানে থাক্‌তে হবে আমায়।'

'কেন ?'

'এখনো আমার ষোল বছর হয় নি কিনা !'

'ও ! তারপর আর বাবার ভয় থাক্‌বে না বুঝি ?'

'ভয় আমি করি না কাউকেই। তবে একে বাবা, তায় বয়সে বড় কি করি বল ? কিন্তু বাবার চেয়ে চাণক্য শ্লোককেই আমার বেশী ভয়, ওই শাস্তরটা বাবা মানেন কি না ! তা, তোমার বাবাও তো তোমাকে মারেন নিশ্চয়ই ?'

'মোটেই না। আদর করবার সময় ছাড়া গায়ে হাতই দেন্ না।'

'বল কি! তোমার বাবা চাণক্যকে মনেন না বুঝি? হায় হায়, তুমি আর মানুষ হবে না!'

'আমার বাবা বলেন গাধা পিটে ঘোড়া ত হয় ছাই, বরং অনেক ঘোড়া পিটুনির চোটে গাধায় গিয়ে দাঁড়ায়।'

কাঞ্চন বিজ্ঞতার সঙ্গে বলে, 'তোমার বাবার দেখ্ছি শাস্তর-টাস্তর পড়া নেই। সমস্কৃত উচ্চারণ করা শক্ত কিনা, সেই ভয়েই পড়েন নি'।

কনক গর্ব্বের সঙ্গে বলে, 'আমার বাবা ইয়া মোটা মোটা ইংরেজি বই বড়েন।'

হতাশার সহিত কাঞ্চন উত্তর দেয়, 'ম্লেচ্ছ হয়ে গেছেন? আর আশা নেই—তোমারও নেই তোমার বাবারও নেই।'

'না থাক গে, আমার বাবা আমায় কত ভালবাসেন। বায়স্কোপে, ফুটবল্ ম্যাচে নিয়ে যান। আমায় কেমন গল্পের বইয়ের লাইব্রেরী ক'রে দিয়েছেন। সাইকেল্ আছে, ক্যারম্ বোর্ড আছে আমার। জন্মদিনে কত উপহার দেন—আমার আস্ছে জন্মদিনে একটা ফাউন্টেন্ পেন দেবেন বলেছেন। পনের—প-নে-র টাকা তার দাম।'

কাঞ্চনের ভারী বিস্ময় লাগে। এ রকম বাবাও পৃথিবীতে আছে নাকি! মোটেই চাণক্য শ্লোকের ধার ধারেন না, তার ওপরে কত প্রাইজ্ দেন্ আবার! আশ্চর্য্য তো! (তার তো এতদিন মনে হ'ত যে বাবা নামক মরুভূমিতে মা-ই একমাত্র ওয়েসিস্। অল্পদিন হ'ল বই পড়ে এই উপমাটা কাঞ্চন আয়ত্ত করেছে)। এ ছাড়া অন্যবিধ বাবার অস্তিত্ব কোনদিন তার কল্পনাতেও আসে নি। বাবা বলতেই তার

মনে হয় 'ওরে বাবা'! আর মা? মা বল্‌তেই যেন গা জুড়িয়ে যায়, মনটা মিষ্টি হয়ে ওঠে, ভাব্‌তে কেমন ভাল লাগে! কিন্তু কনকের কথা যদি সত্যি হয় তা হ'লে বলতে হবে পৃথিবীতে মার-মত-বাবাও আছে, যাকে নিঃসন্দেহ মা'র মধ্যেই গণ্য করা যেতে পারে।

তবু কনকের বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আর রুচি হ'ল না। একটা বাবার সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে পা ঘামিয়ে? মা হ'লেও বরং কথা ছিল। রাস্তা দিয়ে দু'সারি যত লোক যাচ্ছে তাদের মধ্যে ছেলেরা বাদে প্রায় সবাই তো বাবা—কারুর না কারুর?—সব বাবাই প্রায় সমান; এদের যে কোন একজনকে দেখ্‌লেই বাবা-দর্শনের প্রয়োজন মিটে যায়। তাদের গ্রামের যে-ক'টি বাবার সঙ্গে তার পরিচয় আছে প্রত্যেকেই তাঁরা ছেলে মানুষ করতে বদ্ধপরিকর—নিজেদের ছেলের পিঠেই সেই মহৎ প্রয়াসের বিজ্ঞাপন তাঁরা জাহির করেন। কনক যা বল্‌ছে তা সত্যি হ'লে বুঝতে হবে যে ওর বাবাটিই হচ্ছে সৃষ্টি-ছাড়া। সচরাচর বাবারা ও রকম হন না।

'দেখ দেখ, একটা দড়া নিয়ে ওরা কি করছে'—বল্‌তে বল্‌তে কাঞ্চন লাফিয়ে ওঠে। পাশের খেলার মাঠে কোন য়্যাথ্‌লেটিক ক্লাবের স্পোর্ট্‌স্‌ চল্‌ছিল, কাঞ্চন সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। 'একটা দড়ি নিয়ে ও রকম কাড়াকাড়ি করছে কেন? খুব দামী জিনিষ নাকি?'

'ওদের স্পোর্ট্‌স্‌ হচ্ছে।'

'সে আবার কি?'

'কেন, তোমাদের গাঁয়ের ইস্কুলে ছেলেরা খেলা ধূলো করে না?'

'আমরা ডাণ্ডাগুলি খেলি।'

'বাবা! কোন্ অজ্ পাড়াগেঁয়ে তুমি থাক?'—এতক্ষণে বাহাদুরি জাহির করবার সুযোগ পেয়ে কনকের মনটা খুসী হয়। স্পোর্ট্স্ কাকে বলে জানে না এ ছেলেটা! অদ্ভুত! 'ওরা যা করছে ওর নাম টাগ্-অফ্-ওয়ার্—বুঝলে?

বিজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে কাঞ্চন বলে, 'অনেকক্ষণ আগেই বুঝেছি। কিন্তু অত টানাটানি করা কেন? দড়ি তো কম নেই, মাঝখান থেকে কেটে দু'ভাগ ক'রে নিলেই হয়।'

লোকগুলোর নির্ব্বুদ্ধিতা দেখে বিস্ময়ের আতিশয্যে কাঞ্চন এমনই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল যে কখন অজ্ঞাতসারে সে একজন মেমসাহেবের ক্ষিপ্রগতির সামনে এসে পড়েছে তা দেখ্তেই পায় নি। ধাক্কা খেয়ে কাঞ্চনের হুঁস্ হ'ল। তার রাগও হয়ে গেল ভয়ানক। চটে-মটে সে ব'লে উঠ্ল, 'ডোণ্ট্ মেম্।'

মেম সাহেব দুঃখ প্রকাশ করে বল্লেন, 'আই য়্যাম্ সরি।'

কনকের ভারী হাসি পেল, সে বল্ল, 'তুমি দেখ্ছি ইংরিজিও জান না। 'ডোণ্ট্ মেম্' আবার কি হে! মেম-টা কি কোন ভাব্, যে ডোণ্ট্ হবে?'

কি! কাঞ্চন ইংরেজি জানে না! এমন কথা বলে—এই পুঁচ্কে ছোড়াটা তার মুখের ওপর! কাঞ্চন তখনই মেমটির কাছে দৌড়ে গেল। পেছন থেকে ডাক্তে লাগ্ল, 'হিয়ার মি, হিয়ার্ মি স্যার!'

মেমসাহেব দাঁড়িয়ে পড়লেন। কনক ভারী হাসতে লাগ্ল—মেয়েছেলেকে বল্‌ছে কিনা স্যার! কাঞ্চন জানে কাউকে সম্মান দেখিয়ে

কথা কইতে গেলে স্যার্ বল্‌তে হয়, ইস্কুলের মাষ্টার মশাইদের তাই সে বলে—এতে হাস্‌বার কি আছে? কনকের ব্যবহারে কাঞ্চন অত্যন্ত মর্ম্মাহত হ'ল। মেমটির কাছে গিয়ে গম্ভীরভাবে সে বল্‌ল, 'আই য়্যাম্ নট্ ম্যাড্।'

মেমসাহেব বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে, 'হোয়াট্?'

কাঞ্চন তাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়, 'ইউ টেল্ ইউ আর সরি, বাট্ আই টেল্ আই য়্যাম্ অল্‌সো নট্ ম্যাড্। ডু ইউ নো?'

মেমটি হাস্‌তে হাস্‌তে চলে যায়। কাঞ্চন ভুরু কুঁচ্‌কে ফিরে আসে। কনক তখনো হাস্‌ছে। তার মুখের উপর বলে দেয় 'ইউ আর ভেরী ব্যাড্ বয়, আই ডোণ্ট্ টক্ উইথ্ ইউ।' ব'লে সটান্ সে রাস্তা পেরিয়ে সাম্‌নে যে-গলি প'ড়ে তার মধ্যে ঢুকে হারিয়ে যায়

কন‍ে া মুখে হাসি মিলিয়ে আসে। একটু আগেই যে বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী : 'ব তারা কল্পনা করেছে প্রথম সূত্রপাতেই তা যে এম্‌নি ক'রে হঠাৎ ।ছ'ড়ে যাবে ভাবতে পারা যায় না। যাক্ গে—তার বয়েই গেছে। ভারী গুড বয় উনি—অমন একটা মুখ্যুর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে বয়েই গেছে তার। বলে কিনা ডোণ্ট মেম্!

এ-গলি সে-গলি ঘুরে আবার বড় রাস্তায় পড়ে কাঞ্চন। আন্‌মনে সে চল্‌তে থাকে। ভারী ছোট লোক ওই কনকটা! আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটার মাথা খেয়েছেন ওর বাবা! কোনদিন ও মানুষ হবে না। ইংরেজি ও জানতে পারে—মিনির দাদার মত—কিন্তু মানুষ ও হবে না কোনদিন, এ কথা কাঞ্চন হলফ করে ব'লে দেবে। নিয়মিত

প্রহারকে ওর নিত্যকার খাদ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত না ক'রে ওর বাবা ভয়ানক ভুল করেছেন। তাতে কঞ্চনের আর কি এসে যাবে, কনকেরই ক্ষতি! কাঞ্চনের হাত নিস্‌পিস্ করতে থাকে—হঠাৎ তার মনে হয়, একেবারে চলে আসবার আগে কনকের খানিকটা ক্ষতিপূরণ ক'রে দিয়ে এলে মন্দ হ'ত না।

ভঁক্ ভঁক্ ভোঁ—

ধূসর রঙের প্রকাণ্ড একখানা মোটর তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভেতর থেকে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আর একটু হ'লে চাপা পড়তে যে! নিজেও মরতে, আমাকেও মজিয়ে যেতে। রাস্তা চল্‌বার সময় চোখ-কানগুলো থাকে কোথায়?'

আরোহীর আর্তনাদ কানে না তুলে নিষ্পলকনেত্রে সে গাড়ীটার দিকে তাকিয়ে থাকে তার পরে গম্ভীর ভাবে সার্টিফিকেট দেয়, 'ভারী চমৎকার এই গাড়ীটা! কলকাতার সব গাড়ীর চেয়ে ভাল।

তার কথা শুনে ভদ্রলোক ভারী কৌতুক বোধ করলেন। বল্লেন, 'তোমার পছন্দ হয়েছে গাড়ীখানা? চাপবে একটু?'

কাঞ্চনের লোভ হয়, প্রস্তাবটা গ্রহণ করবে কিনা একবার ভাবে। সন্দেহের চোখে ভদ্রলোককে একবার দেখে নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি ডাক্তারি করেন না তো?'

'না। কেন?'

'ডাক্তারদের আমার মোটেই ভাল লাগে না। তাদের গাড়ীতে আমি চাপতে চাই না।'

'না না—আমার চোদ্দ পুরুষে কেউ ডাক্তার নেই।'

আশ্বস্ত হৃদয়ে তখন কাঞ্চন গাড়ীতে উঠে বসে। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি ডাক্তারদের ভয় কর নাকি?'

'উহু, ভয় করি না কাউকে আমি। তবে ভাল লোক নয় ওরা যারা ডাক্তার আর যারা চা বিক্রী করে।

ভদ্রলোক একটু অবাক্ হন, তার পরে বলেন, 'যাক্ গে। ডাক্তারেরা সব জাহান্নমে যাক্, ওই সঙ্গে যত চা-ওয়ালারা। এমন কি

চা-বাগানগুলো গেলেও আমার দুঃখ নেই। আমি না হয় কোকো খেয়েই থাক্‌ব। তুমি আমার একটা কাজ করতো।'

ভদ্রলোক একখানা খবরের কাগজ মেলে কাঞ্চনের সাম্‌নে ধরলেন। গাড়ী চল্‌তে লাগল।

'দেখ, এইগুলো পড়ে দেখ। এগুলো সব ঘোড়ার নাম। এর মধ্যে একটা নাম তুমি পছন্দ কর।'

কাঞ্চন ভারী অবাক্ হয়। এতক্ষণ তো সে ঘোড়ার সঙ্গেই যুদ্ধ করেছে—আবার এখানেও সেই ঘোড়া! কলকাতার লোকগুলোর কি ঘোড়া ঘোড়া ক'রে মাথা খারাপ হয়ে গেছে না কি? সে জিজ্ঞাসা করে, 'কেন?'

'বল্‌ছি পরে। এই দেখ, দশটা নাম আছে। এর মধ্যে কোন্‌টা তোমার পছন্দ?'

কাঞ্চন মনে মনে ভাবে, ওই ঘোড়াগুলো—যারা তাদের তাড়া করেছিল তারা তা হ'লে নেহাৎ কেউকেটা নয়, ছাপার অক্ষরে ওদের সব নাম বেরিয়ে গেছে। মহাত্মা গান্ধী, সি, আর, দাশের সঙ্গে ওদের নাম ছাপা হয় কাগজে—সামান্য কথা নয়! সবিস্ময় কৌতূহলের সঙ্গে নামজাদা ঘোড়াদের মধ্যে একটাকে পছন্দ করার কাজে সে মনোনিবেশ করল। কিন্তু কি অদ্ভুত অদ্ভুত সব নাম। মানে বোঝা দূরে থাক্, বানান্ করাই শক্ত। ভাগ্যিস ভদ্রলোক ওগুলো রিডিং পড়তে বলেন নি। অনেক ভেবে-চিন্তে সে একটা নাম দেখাল।

'মাই মাদার্'? মাই মাদার্ কি জিতবে? আশা কম। আচ্ছা ধরব আমি কিছু ওতে। যদি জেতে, যা পাব অর্দ্ধেক তোমার। কেমন?'

আঠার

কাঞ্চন অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করে, 'ঘোড়া আবার কি জিতবে?'

'রেস্ কাকে বলে জান না বুঝি? রেস্ কয় প্রকার?'

'জানি না ত!'

'দুই প্রকার। হিউম্যান্ রেস্ আর হর্স্ রেস্। আমরা হিউম্যান্ রেসের মধ্যে, কিন্তু হর্স্ রেস্ না হ'লে আমাদের চলে না। বুঝতে পারলে?'

কাঞ্চন ঘাড় নেড়ে বল্‌ল, 'না।'

'তার মানে হিউম্যান্ রেস্এ আমাদের বিশ্বাস ক্রমশঃ কমে আস্‌ছে এবং হর্স্ রেস্এ বাড়ছে। মানুষ হ'লেও ঘোড়াকে ফলো করতে আমরা ভালবাসি।'

কাঞ্চন এবার ঘাড় নাড়ে, 'বুঝতে পেরেছি। অর্থাৎ কিনা আমরা ঘোড়ার রাজত্বে বাস করছি, এই ত? একটু আগেই তা টের পেয়েছিঃ যা ছুটতে হয়েছিল। কিন্তু তখন ত ঘোড়ারাই ফলো করছিল আমাদের?'

'উঁহু, তা নয়, ঘোড়দৌড় কাকে বলে জান না? ঘোড়দৌড়ে বাজি জেতে শোন নি?'

'ও ঘোড়দৌড়? হ্যাঁ, শুনেছি। বাবা বলেন, ওতে বাজি ধরে মানুষ ফতুর হয়ে যায়। ও খেলা ভারী খারাপ! আমার দাদামশায়রা খুব বড়লোক ছিলেন কিন্তু ঘোড়দৌড়ে—'

'ফতুর হয়ে গেছেন ? বরাত খারাপ থাক্‌লে অমন হয়। আমার কপাল খুব ভাল, আমি ত প্রায়ই জিতি। এই যে এসে পড়েছি। ওই হচ্ছে রেস্‌কোর্স্‌। দেখছ, কি রকম লোকের ভিড়! আমি ভেতরে চল্লুম, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আস্‌ব। তুমি এই গাড়ীতেই বসে থাক, চলে যেও না যেন। যা দরকার হয় শোফারকে ব'লো।'

চারিদিকে লোক, কেবল লোক। অনেকখানি জায়গা ঘিরে গোল হয়ে লোকগুলো যেন অনেক দূর পর্য্যন্ত চলে গেছে ; তখনও কত লোক আস্‌ছে, লোক আসার আর বিরাম নেই। কাঞ্চনের সম্মুখ দিয়ে অনেকগুলো অতিকায় অশ্ব চলে গেল। এইগুলোই বুঝি রেসের ঘোড়া ? শোফারকে তিন-চার বার প্রশ্ন করল কিন্তু সে তার একটা কথারও জবাব দিল না। তার দিকে তাকাল না পর্য্যন্ত, যেন তাকে গ্রাহ্যই করল না। কাঞ্চনের ভারী রাগ হ'ল, কিন্তু রেগে আর কি করে ? তার ভারী ইচ্ছা হ'ল ভেতরে গিয়ে ঘোড়দৌড় ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখে কিন্তু কি নিয়ম কানুন কিছুই জানে না ত! তাকে কি যেতে দেবে ? শোফারব্যাটা যে একেবারে মৌনব্রত নিয়ে বসেছে!

অনেকক্ষণ বাদে ভদ্রলোক ফিরে এলেন। হাতে নোটের তাড়া। মোটরে উঠে প্রথমেই একচোট্ খুব হেসে নিলেন।

'আজ একেবারে আপ্‌ সেট্‌। ভারি জিতেছি। তোমার টিপ্‌ ভারী ফলে গেছে। তুমি মাকে খুব ভালবাস, না ? তোমার মাতৃভক্তির জোরেই জিতে গেলাম। "মাই মাদার" জিত্‌বে কেউ ভাবে নি। দশ টাকায় চার শ' সাতার টাকা—একেবারে রেকর্ড পে-মেন্ট।'

'আমি বল্লুম ব'লে জিত্‌ল! তা কি হয়? এ ত ভারী আশ্চর্য্য!'

'আশ্চর্য্য আবার কি? ছেলেদের মধ্যে ভগবান্‌ থাকেন। তাই ছেলেদের কথা ভারী ফলে যায়। তোমার মধ্যে দেবতা আছেন তা জান? যত দিন ছেলেমানুষ থাক্‌বে তত দিন সেই দেবতা থাক্‌বেন—তারপর যত বড় হবে তত—এই খোকার, বাড়ী—না, বাড়ী নয়, চ্যাঙ্গোয়া।'

'চ্যাঙ্গোয়া কি?'

'রেস্তোরাঁ। মানে, চীনেদের হোটেল—ভারী চমৎকার সব খাবার-দাবার। চপ্‌—কাট্‌লেট্‌—ফাউল্‌-কারি—ফ্রায়েড্‌ রাইস্‌—আইস্‌ক্রিম তুমি কখনও সে সব খাও নি।'

'মা বলেন চীনেরা সব আর্সোলা খায়। আর নেংটি ইঁদুর—'

'ওসব বাজে কথা, কুসংস্কার। চীনেরা আমাদেরই মত সভ্য জাত। সভ্য লোকে কখনও ওসব খেতে পারে?'

'চ্যাংগোয়া! নামটা যেন কি রকম!'

'হ্যাঁ, ওদের নামগুলোই খারাপ, আর সব ভাল।'

'আচ্ছা চ্যাংদোলা, এটাও চীনের কথা, নয় কি? আমি তখনি জান্‌তাম। আমি পালিয়ে আসতুম ব'লে পড়ুয়ারা আমাকে ছোটবেলায় চ্যাংদোলা ক'রে পাঠশালে নিয়ে যেত। আমার যা খারাপ লাগত! এখন বুঝতে পারছি ওটা চীন দেশের ব্যাপার।'

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বল্লে, 'ঠিক ধরেছ তুমি। এখন নাম, আমরা এসে পড়েছি!'

সারি সারি কাঠের কাম্‌রা চলে গেছে, পাশ দিয়ে যেতে যেতে পর্দ্দার ফাঁকে কাঞ্চন দেখ্‌তে পেলে প্রত্যেক কাম্‌রায় লোক খাচ্ছে।

কোনটাতে বাঙালী ভদ্রলোক, বাঙালী মেয়েছেলে—আবার কোনটাতে সাহেব-মেম। কাঞ্চনরা একটা কামরায় গিয়ে বসল। ভদ্রলোক ডাকলেন'—'বয়্'। একজন উর্দী-পরা লোক এল, তাকে খাবারের তালিকায় দাগ দিয়ে দিলেন।

কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করল, 'ওই লোকটার নাম কি বয়্? এ রকম নাম কেন? ও কি চীনে? ও তো মনে হ'ল যেন আমাদের—?'

'হোটেলে যারা খাবার পরিবেশন করে তাদের বয়্ বলে। যে বয়্ মানে বালক ও সে বয়্ নয়, ও হচ্ছে সে বয়ের বাবা।'

ছুরি কাঁটা দিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম খাদ্যও এসে উপস্থিত। ভদ্রলোক ছুরি-কাঁটা চালাতে লাগলেন। কাঞ্চন হটবার ছেলে নয়, সেও ছুরি-কাঁটা ধরল, কিন্তু খানিক বাদেই দেখল ও দিয়ে খাবার ধরা যায় না কিন্তু প্লেট্ ওলটাবার পক্ষে ওগুলোই যথেষ্ট। তখন ছুরি-কাঁটা পরিত্যাগ ক'রে হাতকেই এ বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া সমীচীন মনে করল।

এক একটা খাবারের এক এক রকম স্বাদ! আর কেমন সব রহস্যময় নাম! আইস্‌ক্রিম্ জিনিষটাই কি চমৎকার! কাঞ্চনের যেন জন্ম সার্থক হয়ে গেল।

অনেক্ষণ পরে আহারাদি সমাধা হ'লে পর ভদ্রলোক একতাড়া নোট্ কাঞ্চনের হাতে দিয়ে বল্লেন, 'জিত্‌লে তোমাকে অর্দ্ধেক দেব বলেছিলুম। এগুলো তোমার। চল্লিশখানা একশ' টাকার আর একশ'-খানা দশ টাকার নোট্ আছে-মোট পাঁচ হাজার। নাও, ধর। এই ফাও্‌ব্যাগে রাখ—ব্যাগ্‌টাও তোমায় দিলুম।' কাঞ্চন বিস্ময়ে হতবাক্।

'কি ভাব্‌ছ?'

'বর্দ্ধমান লাইনের গাড়ী হাওড়া থেকে কখন ছাড়ে?'

'বাড়ী যাবে? অনেক গাড়ী আছে, তবে শেষ গাড়ী ছাড়ে বোধ হয় রাত এগারোটায়।'

'সেটাতে চাপলে ভোর বেলায় বাড়ী পৌছব। তবে বর্দ্ধমানে গাড়ী বদ্‌লাতে হবে।'

'টাকাগুলো দিয়ে কি করবে?'

'কত কি কিনব। রিষ্টওয়াচ, ফাউণ্টেন্ পেন্, সাইকেল। জামা, জুতো, কাপড়, পোষাক। মণ্টুর জন্য বল্, ন্যাপ্‌লার জন্য খেল্‌না, মোটর গাড়ী এই সব। আর মা'র জন্য যত বিলাসিতার জিনিষ।'

'এ সব কিনেও অনেক টাকা থাকবে। তা দিয়ে কি করবে?'

'মাকে দেব।'

'বেশ বেশ, ভাল কথা। তা তুমি ত দোকানে দোকানে ঘুরে এ সমস্ত কিন্‌তে পারবেনা, আমার এক জানা লোক আছে সে অর্ডার সাপ্লায়ের কাজ করে। চল তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাই। সে-ই সমস্ত কিনে, বেঁধে ছেঁদে ষ্টেশনে গিয়ে বুক করে দেবে—তোমাকে টিকিট কেটে গাড়ীতেও তুলে দিয়ে আসবে।'

সেদিন রাত এগারটার সময় কাঞ্চনকে হাওড়া ষ্টেশনের একটি ফার্ষ্ট ক্লাশ কাম্‌রায় দেখা গেল। তখন গাড়ী ছাড়বার সামান্য মাত্র দেরী। অর্ডার সাপ্লায়ার লোকটি মালের রসিদ কাঞ্চনকে দিয়ে বল্ল, 'সাইকেল্ ইত্যাদি সমস্ত জিনিষ এই গাড়ীরই লাগেজ্ ভ্যানে চলল্, ষ্টেশনে নেমে এই রসিদ্ দেখিয়ে খালাস ক'রে নেবেন। আর মা'র জন্য কাশ্মীরী শাড়ী

জ্যাকেট্, গন্ধ-তেল, এসেন্স, নতুন গুড়ের সন্দেশ—ইত্যাদি সব কিছু ওই স্যুটকেস্‌টায় দিয়েছি, ওটা তো আপনি নিজের কাছেই রাখবেন বল্লেন ? সাইকেলটার পার্টস্ আর খুলিনি—কাঠের ফ্রেমের মধ্যে সাবধানে দিয়েছি। ষ্টেশনে নেমে কুলীদের দিয়ে ফ্রেম্ খুলে ফেলে তখনি চালানো যাবে—ফুল্ পাম্প করা আছে। আর কি ?'

'আর কিছু না। তবে একটা কথা—' কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে কাঞ্চন দু'খানা একশ' টাকার নোট্ বার করল।

আপনার কাছে কিছু চাই না আমার কমিশন্ আমি দোকানদারের কাছে থেকে পাব।'

'না আপনাকে দিচ্ছি না। আচ্ছা কল্‌কাতা সহরে কতগুলো ভিখিরী আছে বলতে পারেন ? দু শ' ?

'পাঁচ শ' ?'—কাঞ্চন আরো তিনখানা নোট্ বার করল।

'তা হবে কেন বলুন তো ?'

'এই টাকাগুলো রাখুন। আপনি কাল একটা মোটর ভাড়া ক'রে একটু কষ্ট ক'রে সমস্ত কল্‌কাতা ঘুরবেন। আপনার চোখে যেখানে যে ভিখিরী পড়বে একটি ক'রে টাকা তাকে দেবেন।'

'টাকা রেখে দিন। এই বাজে খরচ কেন ?'

'বেচারারা পেট ভরে খেতে পায় না, রাস্তার পাত কুড়িয়ে খায়—আমার টাকায় তবু একদিন ভাল-মন্দ ইচ্ছামত খাবে। চিরদিনের দুঃখ ত আমি ঘোচাতে পারব না !'

'আচ্ছা, দিন তবে। এ অপব্যয় কিন্তু। ছেলেমানুষ আপনি, টাকার মূল্য বোঝেন না। গাড়ী ছেড়ে দিল। নমস্কার। আমার নাম, ঠিকানা ত বলেছি। যখন যা দরকার হয় দয়া ক'রে আমাকে লিখ্‌বেন—খুব যত্নে পাঠিয়ে দেব।'

'আচ্ছা আচ্ছা। নিশ্চয় লিখ্‌ব। নমস্কার।'

সুদূর বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে হুস্ হুস্ ক'রে গাড়ী চলেছে—একখানা কামরায় কাঞ্চন একা। জানালায় মাথা রেখে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে কাঞ্চন ভাব্‌ছে– মা'র কথা, বাবার কথা, ন্যাপ্‌লা ও মণ্টুর কথা, মিনির কথা, কনকের কথা। কোথায় রইল কনক, কোথায় বা মিনি ! তাদের নাম জান্‌ল শুধু, কিন্তু ঠিকানা, জানে না। কোনদিন কি এ জীবনে আর দেখা হবে তাদের সঙ্গে ?

ভাব্‌তে ভাব্‌তে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে, টিকিট্-চেকারের ডাকে যখন ঘুম ভাঙল তখন ভোর।

'এ কি বৰ্দ্ধমান? এখানে গাড়ী বদ্‌লাতে হবে?'

'বৰ্দ্ধমান অনেকক্ষণ ছাড়িয়ে এসেছে। টিকিট্ দেখি? এই ষ্টেশনে নাম্‌তে হবে। একটু পরেই একখানা ডাউন গাড়ী আস্‌বে সেই গাড়ী বৰ্দ্ধমান যাবে। গার্ডকে তোমরা আগে বলে রাখা উচিত ছিল, তা হ'লে বৰ্দ্ধমানে নামিয়ে দিত, ওভ্যারক্যারেড্ হয়ে তা হ'লে এই অসুবিধা পোহাতে হ'ত না!'

'যাক্ যা হবার হয়ে গেছে। নরম গদি-আঁটা বিছানায় শুয়ে ভারী ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কোথা দিয়ে রাত কেটেছে টের পাই নি। আচ্ছা, এই ডাউন গাড়ীতে চাপ্‌লে আমার বাড়ীর ষ্টেশনে কখন পৌছব?'

'এই দুপুর নাগাদ। বৰ্দ্ধমানে নিশ্চয়ই করেস্‌পণ্ডিং ট্রেন্ পাবে, তবে বোধ হয় ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করতে হবে, সেই সময় 'রেষ্টুরেন্ট্-কারে খেয়ে-দেয়ে নিতে পার।'

কাঞ্চন যখন তার বাড়ীর ষ্টেশনে পৌছল তখন দুপুর পেরিয়ে গেছে। সেদিন গাড়ী একটু 'লেট্' ছিল। রসিদ দেখাতেই ষ্টেশন মাষ্টার বল্লেন, 'এ সব মাল তো আজ সকালের গাড়ীতে এসে পড়ে রয়েছে! তুমি বুঝি গাড়ী বদলাবার সময় গাড়ী ধরতে পার নি?'

'প্রায় সেই রকম। দেখুন আমি শুধু আমার সাইকেল্‌টা এখন নেব। বাকি জিনিষপত্র পরে লোক এসে নিয়ে যাবে কিংবা আপনি যদি একটা কুলী দিয়ে পাঠিয়ে দেন—'

'তাই দেব।' বলে ষ্টেশন মাষ্টার তার টিকিট্‌খানি নিয়ে চলে গেলেন।

বাড়ী থেকে পালিয়ে

কাঞ্চন সাইকেল্‌টার প্যাকিং খুলে পিছনের ক্যারিয়ারে স্যুট্‌কেসটাকে শক্ত করে বাঁধ্‌ল। তার পরে সাইকেলে চেপে কাঞ্চন বোঁ বোঁ ক'রে তার বাড়ীর দিকে পাড়ি দিল।

উনিশ

বাড়ী পৌঁছে কাঞ্চন একবার ভাল ক'রে চারিদিক্ চেয়ে দেখ্‌ল। কেউ কোথাও নেই। চাকরটাকেও দেখ্‌তে পেল না। সাইকেলটাকে বাইরে রেখে পা টিপে ভেতরে গেল। মন্টু, স্বাপ্‌লা—এরা গেল কোথায়? হয় ত পাড়ায় কোথাও খেলতে গেছে। মা? ঐ যে মা একটা বই হাতে নিয়ে—ঘুমুচ্ছেন নাকি?—না, জেগেই আছেন যে!

কাঞ্চনকে দেখে মা আনন্দে চেঁচাতে যাবেন, কাঞ্চন তাঁর মুখ চেপে ধরল। '—মা, চুপ্, বাবা, কোথায়?'

'উনি? খেয়ে-দেয়ে ঘুমুচ্ছেন।'

'বেঁচেছি তা হ'লে।'

'তোর ওপর ওঁর আর রাগ নেই। তুই চলে যাওয়াতে ওঁর মন

খারাপ হ'য়ে গেছে। এ ক'দিন ভাল ক'রে খেতে পর্য্যন্ত পারেন নি। আমি ত কেঁদে বাঁচি নে। কোথায় ছিলি তুই? তোর জন্তে আশ-পাশের গাঁ সব তোলপাড় হয়ে গেছে—তোর ক্লাসের সব ছেলের বাড়ী—'

'আমি বুঝি এখানে ছিলুম? আমি যে কোলকাতায় গেছ্‌লুম।'

'কোলকাতায়? অবাক্ কল্লি। পয়সা পেলি কোথায়?'

'অম্‌নি। আমার কি কোথাও যেতে পয়সা লাগে? কত টাকা রোজগার ক'রে আন্‌লুম—তোমার জন্ত।'

মা'র যেন বিশ্বাস হয় না। অতটুকু ছেলে কাঞ্চন, সে করবে টাকা রোজগার?

'বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখ সোনার হাত-ঘড়ি। এই দেখ ফাউণ্টেন্ পেন্—এইটেরই দামই পনের টাকা। কেমন নতুন ফ্যাসানের জুতো দেখ।'

তাই ত! মা একেবারে অবাক্।

'কিন্তু তোর গায়ে একি মণি! চটের মত জামা-কাপড় পরেছিস্, এ তোকে মানাচ্ছে না।'

'এ বুঝি চট? তুমি হাসালে মা। এ যে খদ্দর। খদ্দর পরলে ভদ্দর হয়। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন। গান্ধী কে জান? খুব মহৎ লোক, বয়সে খুব বড় তবু যেন ছেলেদের মত মন!'

'তা হোক্, তবু এ কাপড় তোর গায়ে সাজে না। তোর জন্তে আমি সিল্কের জামা, তাঁতের কাপড় আনিয়ে রেখেছি!'

'বা, আমি যে প্রথমে ওই সব কিনেছিলুম—কিন্তু ভেবে দেখ্‌লুম ওর চেয়ে খদ্দর ভাল। কনক মোটা খদ্দর পরে, আমিও তাই

পরলুম। আমার সে জামা-কাপড়গুলো ট্রাঙ্কে তোলা আছে, বিনোদের জন্য এনেছি। ওকেই দিয়ে দেব।'

'কনক কে?'

'আমার বন্ধু। তার কথা তোমায় রাত্রে শুয়ে শুয়ে গল্প করব। তার কথা, মিনির কথা, কলকাতার ভোজের কথা—হ্যাঁ, তোমার জন্য আমি চমৎকার সন্দেশ এনেছি, তুমি যে লুচি দিয়ে খেতে ভালবাস; ট্রাঙ্কে আছে, খেয়ে দেখ, গাঙ্গুলির সন্দেশ তার কাছে কোথায় লাগে!'

'আমার জন্য তো সন্দেশ আনলি, তোর বাবার জন্য কি এনেছিস্?'

'বাবার জন্য কি আর আন্‌ব? কেবল একটা সোনা-বাধানো ছড়ি। জানি ওটা কোন্ দিন আমার পিঠেই ভাঙ্‌বে, তবু আন্‌লুম।'

'আর মন্টু, ন্যাপ্‌লা?'

'ওদের জন্য বল্, ব্যাট্, ট্রাইসিকেল্, কত রকম খেল্‌না, পুতুল, মোটরগাড়ী—কত কি! তোমার জন্য কত গল্পের বই এনেছি। সে সব ট্রাঙ্কে আছে—তিনটে বড় বড় ট্রাঙ্ক্ বোঝাই কত জিনিস! ষ্টেশন মাষ্টার কুলী দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।'

'এত টাকা পেলি কোথায়?'

'সে তোমায় সব রাত্রে বল্‌ব। ধরে নাও না কেন ভগবান আমায় দিয়েছেন। এমন কি হয় না?'

'তা হয়। কলকাতার কোথায় বেড়ালি? কি দেখ্‌লি? চিড়িয়াখানা, পরেশনাথের মন্দির, শিবপুরের বাগান—এ সব দেখেছিস্?'

'না, সময় পাই নি। তা ছাড়া, কোথায় যে ওগুলো আছে জান্‌তুমও না। এত ত হেঁটেছি, কোন দিন পথের ধারেও পড়ে নি। পড়লে কি

আর না দেখে ছাড়তাম? তবে এমন একটা জায়গা দেখে এসেছি যা কলকাতা গিয়েও লোক দেখ্‌তে পায় না।'

'কি জায়গা রে?'

'রেস্‌ কোর্স'—সেখানে ঘোড়দৌড় হয়। সে সব রাত্রে বলব। ভারী মজার গল্প। এখন একটা কথা শুনবে? তোমার পায়ে পড়ি মা।'

ব'লে কাঞ্চন স্যুটকেস্ খুলে শাড়ী, জ্যাকেট্ ইত্যাদি বার করে। 'এইগুলো তোমায় পরতে হবে মা।'

'এখন?'

'হ্যাঁ, এখনই। আমি দেখ্‌ব।'

ছেলের আব্দার, কি করেন, মাকে পরতে হ'ল। কাঞ্চন বল্লে—'বাঃ, তোমাকে কি চমৎকার দেখাচ্ছে মা! সত্যি! এইবার এই জিনিষটা মুখে মাখো দেখি। এটার নাম হিমানি—এক রকম স্নো। এইবার তুমি এই কৌচটায় ব'স। আমি তোমায় পূজো করব, অঞ্জলি দেব।'

কাঞ্চন নোটের তাড়া নিয়ে মার দিকে ছুঁড়ে দেয়—বৃষ্টির মত চারিদিকে নোট্‌গুলো ছড়িয়ে পড়ে। মা দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে চেয়ে থাকেন, তাঁর মুখ থেকে কথা বেরয় না।

'কোত্থেকে এত টাকা পেলুম ভাব্‌ছ? সে তোমাকে এক কথায় বোঝাতে পার্‌ব না। আগে বল দেখি রেস্ কয় প্রকার? দুই প্রকার, —কিন্তু সে বোঝাতে অনেকক্ষণ লাগ্‌বে। বিশু কাকা যেমন লটারীতে অনেক টাকা পেয়েছিল না, আমি এক রকম তাই পেয়েছি। না, না, ওগুলো কুড়িয়ো না, অম্‌নি চারিদিকে ছড়িয়ে থাক্। তুমি মাঝখানে বসে থাক মা!'

মা হতভম্ব হয়ে বসে থাকেন।

'মা, একটা কথা বল্‌ব? তোমার কোলে একটু বস্‌ব। আমি বড় ভারী হয়ে গেছি, তোমার লাগ্‌বে কিন্তু।'

কাঞ্চন গিয়ে মা'র কোলে বসে। মা'র গলা জড়িয়ে ধরে। মা কাঞ্চনের কপালে একটা চুমু খান্। কাঞ্চন মা'র বুকে মুখ লুকায়।

মা'র চোখ দিয়ে জল পড়ে।……

'বাঃ, তোমার দোকানে ছাতুও আছে দেখছি যে!'

'তোমার চাই?'

'হ্যাঁ।'

হ্যাঁ বল্‌ল বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার মুখ চুণ হয়ে গেল! তার অনুৎসাহ দেখে দোকানী প্রশ্ন করল, 'ক' পয়সার চাই তোমার?'

'পয়সাই যে নেই আমার কাছে। শুধু একটা আনি আছে তাও আবার অচল।'

'দেখি আনিটা। অচলই বটে, তবে আমার কাছে চলে যাবে। এর বদলে তোমাকে দু পয়সার ছাতু দিতে পারি।'

অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে কাঞ্চন বলল, 'তাই দাও।'

একটা শালপাতায় তেল নুন লঙ্কা দিয়ে মাখা সেই ছাতু প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা অনাহারের পর কাঞ্চনের কাছে সে রাত্রের সেই বিয়ে বাড়ীর ভোজের মতই উপাদেয় মনে হতে লাগল। আহার সমাধা করে আর এক ঘটি জল খেয়ে কাঞ্চন দোকানীকে জিজ্ঞেসা করল, 'কাছাকাছি কোথাও পার্ক আছে বল্‌তে পারো?'

'হ্যাঁ, এই রাস্তা দিয়ে নাকের সোজা বরাবর চলে যাও মির্জ্জাপুর পার্ক পাবে। কেন পার্ক কি জন্যে?'

'খাওয়া তো হ'ল, এইবার একটি তোফা ঘুম দিতে হবে। কাল থেকে বড্ড হাঁটছি, আজ আর তা নয়।'

তুমি দেশ-পাড়াগাঁ থেকে এসেছ? একলা বুঝি—'

কাঞ্চন দোকানীর অনধিকার-চর্চ্চার প্রশ্রয় দেওয়া আদৌ সঙ্গত